বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
402436

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার

402436

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৮/ ১৯৯৯-২০০০) কর্তৃক উপস্থাপিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : উপমা চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার' শীর্ষক এম ফিল পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

(ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার' শিরোনামায় বর্তমান অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে। ২০০২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে এম ফিল কার্যক্রমে যোগদান করি। নানাবিধ প্রতিবন্ধকতায় বিলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ শেষ পর্যন্ত যে পূর্ণরূপ লাভ করেছে তা মূলত আমার তত্ত্বাবধায়কের নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও সহৃদয় সহযোগিতার ফল। অভিসন্দর্ভের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও নির্দেশনা। তাঁর প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

এম ফিল গবেষণায় আমাকে উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন। অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণসহ গবেষণার প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া সম্পাদনে তাঁর মূল্যবান উপদেশনা আমার জীবনের এক গৌরবময় অর্জন।

গবেষণাকালে আমি মুখ্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার ব্যবহার করেছি। এই সুযোগে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে জানাই ধন্যবাদ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য নন্দনতত্ত্ব, চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ে আমাকে প্রথম আগ্রহী করে তোলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব হাকিম আরিফ। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একইসঙ্গে, স্মরণ করি ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী-সহ আমার সকল সহকর্মীর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা। গবেষণা সংক্রান্ত নানা পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামাল, ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক এবং সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলামকে। অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ পরিকল্পনার নানাবিধ সূক্ষ্ম বিষয়ে সহযোগিতা করেছে আবাল্য সুহৃদ আলাউদ্দিন আহমেদ।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাবা-মা ও বড় বোনের পরম আশীর্বাদ আমাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে। স্বেচ্ছায় নির্বাসনতুল্য জীবন বেছে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছে হৃদয়মিতা সাজেদা হক।

সবশেষে শিশুকন্যা অমিয়ার জন্য রইল অফুরান স্নেহাশিস; যার অবুঝ হাসিমাখা মুখ এই গবেষণা কাজে জুগিয়েছে নিরন্তর উদ্যম আর প্রেরণা।

–গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

প্রথম অধ্যায় : ঔপন্যাসিক গদ্যে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্কিম-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক ২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উপমা-চিত্রকল্প

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ প্রতীক

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক ৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উপমা-চিত্রকল্প

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ প্রতীক

চতুর্থ অধ্যায় : উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়ন : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১১৬

উপসংহার ১২৩

পরিশিষ্ট ১২৫

উপমার সম্পূরক তালিকা

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ঔপন্যাসিক গদ্যের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীপ্রতিভা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সূত্রে সূচিত দিকনির্দেশনাশূন্য বাংলা গদ্য-চর্চায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) সঞ্চার করেন শৈল্পিকতা। কাল ব্যবধানে আবির্ভূত প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) গদ্যসাহিত্যচর্চা শেষ অবধি আদর্শভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও *আলালের ঘরের দুলালের* (১৮৫৮) আশ্রয়ে বাংলা গদ্যে সঞ্চারিত হয় কথ্যরীতিকে ধারণ করবার সাহস। কিন্তু ভাব ও শিল্পরীতির অনিবার্য সম্বন্ধসূত্রে উপন্যাস যে নিগূঢ় অর্থে সমগ্রতাস্পর্শী আধুনিক শিল্পপ্রতিমানকে ধারণ করে, তার যথোপযুক্ত গদ্যভাষা সৃজনের কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনিই বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ শিল্পী। রোমান্সের কাঠামোয় তাঁর সাহিত্যবিশ্বের সীমারেখা অঙ্কিত; উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত খণ্ডিত রেনেসাঁসিয় আধুনিকতা, রোমান্টিসিজম, উপযোগিতাবাদ, সনাতন ধর্ম, অনুশীলন তত্ত্ব, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি পরস্পর বিপ্রতীপ জীবনবোধের দ্বান্দ্বিক সমাবেশে তাঁর মানসজগৎ পরিণতিপ্রাপ্ত। কিন্তু এ জটিল মনোসমীকরণের বিতর্কপ্রবণ প্রান্তসমূহকে অভিন্ন বিন্দুতে সন্নিবেশিত করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর নন্দনচেতনা। ফলে সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে উপযোগিতাবাদ কিংবা ধর্মাচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাস প্রধানত শিল্পবোধে অন্বিত। তাই, তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসসমূহে ঐকান্তিক শিল্পভাবনার নিকটই তিনি চূড়ান্তভাবে নিজের শিল্পীসত্তাকে সমর্পণ করেন। অন্যদিকে, উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস বিকাশলগ্নেই বহুমাত্রিক শিল্পবোধে বৈচিত্র্যসন্ধানী, নান্দনিকতায় বিশ্বমানপ্রত্যাশী। বঙ্কিম-যুগের শিল্পপ্রভাবকে আত্মস্থ করেও রোমান্সের স্বতন্ত্র পরিচর্যায় তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার যাত্রারম্ভ। তবে, ধূসর অতীতের শৈল্পিক পুনর্গঠন নয়, বরং স্বদেশ-সমাজ-সমকালের কেন্দ্রবিমুখী বলে (centrifugal force) দোদুল্যমান নরনারীর স্তরবহুল হৃদয় ও তাদের অতিসংবেদনশীল জীবনার্থের প্রতি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্র উপন্যাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে। একইসঙ্গে, সমকালিক হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদ, শতকান্তরের পরিবর্তিত কালপট, প্রথম মহাসমরের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর তাঁর রচনায় শিল্প-সংস্পর্শে চিত্রিত ও উত্তীর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নান্দনিক উচ্চতার ভরকেন্দ্র মূলত সুগভীর রসবোধ ও স্বোপার্জিত গদ্যরীতির অসামান্য শিল্প-সামর্থ্যে সমন্বিত হয়। কথাসাহিত্যের আঙিনায় সৃষ্টিশীল কল্পনা আর তার গদ্যময় শব্দসৌধ যে নিবিড়তম সম্পর্কসূত্রে সৃজিত ও নন্দিত, তার সৌন্দর্য-নির্যাস মূলত ভাষিক স্থাপত্যকলায় প্রোথিত থাকে। কেননা শৈল্পিক গদ্য কেবল আটপৌরে স্বভাবোক্তি নির্ভর নয়;

Dhaka University Institutional Repository

নানাবিধ প্রসাধনে সুসজ্জিত বক্রোক্তির জটিল সহাবস্থানে এর প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতা। বিশেষত, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ-বৈচিত্র্য কথাসাহিত্যের সুচিহ্নিত এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কবিভাষায় উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার এবং তাদের সাহিত্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একটি বহুপ্রচল বিষয়। কবিতা যেহেতু স্রষ্টার অন্তর্লীন সংবেদনার শিল্পময় অভিপ্রকাশ, সেহেতু এতে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের পরম অনুভবের অনেকান্ত শব্দবয়ন অসম্ভব নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক, কবিসদৃশ আত্মময়তায় অবগাহন করেন না; দেশ-কালের এক অলঙ্ঘ্য সাপেক্ষতায় তিনি স্পর্শ করেন সামাজিক মানুষের গহীন মনস্তত্ত্ব। জটিল, অমিত্র-ভাবানুষঙ্গকে শব্দসুতায় গ্রন্থিত করতেই তাই তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ। ফলে, জীবনসমগ্রের বাস্তব-সতর্ক শিল্পনির্মাণের দায়বদ্ধতা আর গীতল কাব্যিকতার প্রতি আকুল প্রণোদনা— জৈব ঐক্যে ঔপন্যাসিককে করে তোলে সৃষ্টিশীলতায় আত্মবিশ্বাসী। সৃজনশীল ঔপন্যাসিকের আবেগ-কল্পনায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোজিত হয় নানাবিধ আলঙ্কারিক শব্দ-প্রতিমান; তাঁর সামগ্রিক বক্তব্য-নির্যাস আলোকিত করে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের শিল্পজগৎ। এ কারণে একমাত্র কাব্য নয় বরং সাহিত্যিক রূপকল্পের যে কোনো মাধ্যম তথা উপন্যাস হতে পারে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বিশেষত, কোনো কবি-স্বভাবী শিল্পী কিংবা কোনো কবি যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন এই বহুস্তরিক শিল্পসমস্যা নতুনতর মাত্রায় অভিদ্যোতিত হয়। তাঁদের কাব্যপ্রাণতা, উপন্যাসের জনজীবনে বারংবার উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয়ে ব্যক্তি-আত্মার নিঃসীম স্বাতন্ত্র্যের জগৎকে স্পর্শ করতে চায়। ফলে, উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক স্থানকালের সীমায় আয়ত্ত করে নান্দনিক শিল্প-অবয়ব।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার বিশ্লেষণ প্রধানত নন্দনতত্ত্বের বিষয়। তবে, নন্দনতত্ত্বে এ সকল শিল্প-উপকরণের অন্তর্শায়িত ভাব-অভিব্যক্তির রসোত্তীর্ণতা যতখানি মুখ্য, সেই তুলনায় এদের অবয়বগত সৌকর্য ও বিন্যাসের তাৎপর্য ততখানি বিবেচ্য নয়। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষত প্রতীচ্য সমালোচনা রীতিতে বিভিন্ন আন্তর্জ্ঞানসূত্রের ব্যবহার এবং এদের আশ্রয়ে নান্দনিক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রবণতা বহুদৃষ্ট। নন্দনতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট আন্তঃসম্পর্কী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানের (semiotics) তাৎপর্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ জ্ঞানশাখার অন্যতম আলোচ্য হল নিজস্ব প্রণালীতত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো সাহিত্যরূপের পাঠকৃতি (text) বিশ্লেষণ। অর্থাৎ, নন্দনতত্ত্ব যেখানে কোনো একটি শিল্প-উপকরণ কীভাবে সহৃদয়-সামজিকের মনে সংবেদনা জাগায় তা ব্যাখ্যা করে, চিহ্নবিজ্ঞানের মৌল অন্বিষ্ট সেখানে সেই রসময় বোধের সঙ্গে রসোদ্দীপক পাঠকৃতির অন্তর্লীন প্রতিসাম্য নির্দেশ। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য প্রমাণে নন্দনতত্ত্বের সহায়করূপে চিহ্নবৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শৈলীবিজ্ঞানের (stylistics) বিভিন্ন তত্ত্ব ও স্বীকার্যের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, শৈলীবিজ্ঞানও নিজস্ব পদ্ধতির আলোকে বাহ্যিকস্তরে সক্রিয় ভাষিক সংগঠন ও বিন্যাসের বস্তুধর্মী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক নন্দন অভিযাত্রার পথকে অনুধাবনযোগ্য করে তুলতে সহায়তা প্রদান করে। সুতরাং, বলা যায় যে, প্রধানত চিহ্নবিজ্ঞান ও সীমিতপরিসরে শৈলীবিজ্ঞানের সহযোজনায় উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্বকে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আধুনিককালে বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় এ সকল বহুসমন্বিত তত্ত্ব প্রয়োগের মেধাবী প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পবিত্র সরকার, শিশিরকুমার দাশ, দেবেশ রায়, আশিসকুমার দে, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ, বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির উল্লিখিত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান অভিসন্দর্ভের মৌল প্রতিপাদ্য প্রমাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁদের রচিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রধানত তাঁদেরকে অনুসরণ করা হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্বে চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক কিংবা প্রত্যক্ষ আলোচনার ক্ষেত্রটি এখনো অকর্ষিত। সুতরাং, এরূপ সমন্বিত জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়াসে এই দুই ঔপন্যাসিকের রচনায় নতুনতর আলোকপাত সম্ভব।

আধুনিক সাহিত্য বিবেচনার সহযোগী পদ্ধতিরূপে বিবেচিত চিহ্নবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় হল বিশ্বজাগতিক সকলকিছুকেই বিশিষ্ট চিহ্নতন্ত্রের (sign-system) অন্তর্ভুক্ত করা। ফলে, উপন্যাসের পাঠকৃতি ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত। চিহ্নবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিশেষ কাঠামো নির্দেশ, যার গতিধারা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি অভিমুখী। চিহ্নবৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রীয় আলোচ্য হল চিহ্ন, যার সংগঠনে চিহ্নায়ক (signifier) এবং চিহ্নায়িত (signified) প্রধান ভূমিকা পালন করে। যে কোনো চিহ্নের চিহ্নায়ক হল সংশ্লিষ্ট বস্তুর (object) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়ব (sensory pattern), অপরদিকে চিহ্নায়িত হল এর অন্তরালে সংপ্রোথিত বিমূর্ত ধারণা। সুতরাং চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িতের এ প্রতিসমতা উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গভীরতাকে অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, ঔপন্যাসিক-গদ্য সৃজনে আলঙ্কারিক ভাষার সুবিন্যস্ত সংযোগকে ভাষাবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সূক্ষ্মতায় বর্ণনা করে শৈলীবিজ্ঞান। সাহিত্য ভাষার নান্দনিক মাত্রার স্বাভাবিক উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়েই এতে প্রাধান্য পায় ভাষিক বাস্তবতা। ভাষার ধ্বনি রূপ বাক্য ও বাগর্থস্তরের রচনারীতিকে ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শৈলীবিজ্ঞান উপন্যাসকে ব্যতিক্রমী কৌশলে ব্যাখ্যা করে। ফলে, চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্ব অনুধাবনে যোজিত হয় নতুনতর মাত্রা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঔপন্যাসিক গদ্যে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক গদ্যে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সাহিত্যশিল্পীর সৃজনশৈলীর নান্দনিক শিল্প-উপকরণ। সাহিত্য যেহেতু একান্তভাবেই মানবভাষা-নির্ভর, সেহেতু চারুভাষার নিপুণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের শিল্পসৌধ গড়ে ওঠে। ভাস্কর্য-প্রতিম এই ভাষিক শিল্পশরীরকে রচয়িতার বোধিবৈশ্বিক আবেগ-অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলন-নিরীক্ষার অভিজ্ঞান করে তুলতে ব্যবহৃত হয় বিচিত্র প্রসাধন কৌশল। ফলে, উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের মতো প্রকরণ-আশ্রয়ী উপাদানসমষ্টির ভূমিকা কেবল ভাষার উপরিতলের সীমায় আবদ্ধ থাকে না; স্বতঃঅবগাহনে এরা সাহিত্যের বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে নন্দন-শ্রেয় সেতুবন্ধকে দ্যুতিময় করে তোলে। সূক্ষ্মতর বিবেচনায় সাহিত্যের সকল শাখা বিশেষত উপন্যাসের নন্দনতত্ত্ব বিবেচনায় এদের উপস্থিতি অপরিহার্য। উপন্যাসসাহিত্যে এ সকল শিল্পবস্তুর আশ্রয় ও বিস্তার পাঠকৃতির অন্তস্তলস্পর্শী; কবিতা থেকে স্বতন্ত্র স্বরবৈচিত্র্যে এরা উপন্যাসের আকরণে (structure) সন্নিবেশিত হয়।

শব্দ ও অর্থের অ-পূর্ব সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে সৃজিত হয় উপন্যাসের বাণী-অবয়ব। ভাষার প্রদৃষ্ট এই শব্দস্তর, তার অসীমচারী অর্থশক্তিকে সংকেতরূপে সঞ্চালিত করে মানব মনীষার অতল অন্তর্লোকে। গতিশীল এই প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের বাণীসম্ভারে সঞ্চিত হয় বিশিষ্ট উদ্দীপনশক্তি, যা প্রাত্যহিক শব্দরাশিকেও পারিবেশিক-শর্তে অভূতপূর্ব অর্থকাঠামোয় নতুনতর করে তোলে। ফলে, অবচেতনাতল উৎসারিত অনির্বচনীয় ভাবসম্পদের গভীর আবেদন অর্জন করে শৈল্পিক প্রকাশমুখিনতা; আভিধানিক বুৎপত্তির সীমা পেরিয়ে তা স্পর্শ করে ব্যঞ্জনাময় অনুভবপুঞ্জের পরিবর্তমান বিন্যাস। এই অনুভবপুঞ্জ মূলত মানব-মস্তিষ্কের গভীরে অণু-অবয়বে গ্রথিত থাকে। শিল্পবোধ-সঞ্চারী হৃদয়ের নিশ্চেতনার জগৎ যখন সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে, তখনই এরা বিচিত্র বিন্যাসে নানাবিধ মানুষিক আবেগের সহযোগে ক্রমশ সচেতন স্তর অভিমুখী হয়। মানব অন্তরের এই বিমূর্ত অনুভব ভাষার আশ্রয়েই অর্জন করে শিল্পরূপায়ণ-দক্ষতা। অতল স্মৃতির ভাষিক প্রতিবর্তক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে আগত শব্দার্থ উপন্যাসের আখ্যান ও চরিত্রের গতিধারার সঙ্গে লেখকের বোধ এবং পাঠকের উপলব্ধিকে অনন্য ঐক্যসূত্রে সমন্বয় করে। ফলে উপন্যাস হয়ে ওঠে নিয়ত সৃষ্টিশীল বোধিময় মনোভাষার শিল্প-প্রকাশ; যথার্থ নান্দনিকবোধের আশ্রয়েই কেবল যার সংহিতা-আবৃত শিল্পজগৎ উন্মোচন করা সম্ভব। ঔপন্যাসিক-ভাষার এ বিশেষত্ব সৃজনে রচয়িতা আকাশ-প্রতিম বিশালতায় আত্মস্থ করেন প্রাণময় শব্দমালা, যারা স্থানকালের পারম্পর্যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিল্পবোধের

Dhaka University Institutional Repository

মানস-প্রতিনিধিরূপে পাঠকৃতিতে সারি বাঁধে। শব্দ যেহেতু মানবসমাজ ও সভ্যতার শাশ্বত ধারক সেহেতু তিনি নিজস্ব আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং সঞ্চারমান বোধির আশ্রয়ে জীবনসমগ্রের শিল্পিত ব্যাখ্যা প্রদানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শিল্প সৃজনই স্রষ্টার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়ায় উপন্যাসের শব্দপুঞ্জ কখনো অলঙ্কারের কারুময়তায়, কখনো চিত্রকল্পের চেতনাপ্লাবী আবেদনে, কখনো লক্ষ্যভেদী প্রতীকতায় অর্জন করে রসনিবিড় অবস্থান। চিত্রকলার বহুবর্ণিলতা কিংবা শব্দস্রোতের গীতময় সুরমূর্চ্ছনার মেলবন্ধন সূচিত হয় উপন্যাসে। অর্থাৎ শব্দময় ভাষিক অনুষঙ্গ তার সর্বোচ্চ গীতল ও চিত্রল শক্তি নিয়ে বিন্যাস করে উপন্যাসের শিল্পালোকিত ভাববিশ্ব। প্রসঙ্গত, স্মরণযোগ্য :

> কাব্যের [সাহিত্য অর্থে] প্রায়-অনির্বচনীয় প্রায়-অবিশ্লেষণীয় যে-মাধুর্যে আমাদের শিল্পান্বেষী চিত্ত আনন্দ লাভ করে সে-মাধুর্য মুখ্যত ভাষা-নির্ভর। প্রত্যেক কবির ভাষাপ্রয়োগে স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট, প্রত্যেক কবি— তথা, সাহিত্যস্রষ্টা— তাঁর বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগে ভাষাকে অগ্রগত ক'রে দেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে প্রত্যেক সাহিত্যিকের স্বকীয়তা সমসাময়িক ভাষার গুণাবলীর ভিত্তিতেই নির্মিত। সাহিত্যিকের হাতে সমসাময়িক ভাষা ব্যঞ্জনা পায় সন্দেহ নেই। (অমলেন্দু বসু ; ৫৭-৫৮: ১৯৭২)

এ কারণে স্বকীয় শব্দানুষঙ্গের প্রতি ঔপন্যাসিক মাত্রেরই থাকে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ফলে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রায়োগিক যথার্থতা এবং অনন্য ব্যঞ্জনাসামর্থ্য সৃজনশীল রচয়িতার প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে উপন্যাসের ভাষিক অবয়বে, সংশ্লিষ্ট রচনাকে করে তোলে শিল্পদীপ্ত। বস্তুত, উপন্যাসে বিন্যস্ত প্রতিটি সফল শিল্প-উপকরণের মধ্যেই বিধৃত থাকে কাহিনী, চরিত্র এবং রচয়িতার শিল্পবোধের ঐক্যসূত্রে গড়া এক প্রাণময় সংরাগ, যা ধাপে ধাপে হয়ে ওঠে বস্তু বা আবেগের প্রতীক। এ কারণে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের অন্তঃস্রোতেও প্রবাহিত হয় বিমূর্ত বোধের দ্যোতনা। উপস্থাপনকলার উৎকর্ষে এরা দৈনন্দিনতার মধ্যেও অর্জন করতে পারে বৈশেষিক শিল্পব্যঞ্জনা। সেইসঙ্গে, সমাজ-অর্থ-রাষ্ট্রনীতির সমন্বিত প্রতিফলনে নিয়ত পরিবর্তনশীল মানব চেতনাজগৎ যে রূপান্তরধর্মিতায় স্বতঃচালিত, তাকেও শব্দার্থের অনন্ততাসূত্রে আবদ্ধকরণে সক্ষম হয় উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক। একইসঙ্গে এরা উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক সঞ্চারপথে চালিত করে পরিশীলিত ভাব ও বোধের অখণ্ড আবেশ। এ সকল শিল্প-উপকরণের উপস্থিতি প্রায়শই সামবায়িক ; একটি অনিবার্য যূথবন্ধনে এরা অংশ থেকে সমগ্রের আবেদনকে সৃজন করে। অর্থাৎ একক উপন্যাসে বিন্যস্ত প্রতিটি উপমা, চিত্রকল্প এবং প্রতীক-ই একদিকে স্বকীয় একক, অপরদিকে কেন্দ্রীয় বোধের প্রতিনিধিত্বে নিবিড় সংযোগে সামূহিক।

১

উপন্যাস 'আধুনিকের হাতে রচিত কালের গদ্যময় প্রতিমা' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩:১৯৮৮)। এ প্রতিমার হয়ে-ওঠা একান্তভাবে গদ্যের সুনির্বাচিত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, গভীর জীবনরসে ঋদ্ধ শিল্পময় গদ্যভাষার নিখুঁত বিন্যাস ব্যতীত উপন্যাস সৃজন অসম্ভব। লক্ষণীয় যে, সামগ্রিক মানবজীবনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রার জৈবসংশ্লেষ যেমন ঔপন্যাসিক-গদ্যের কাম্য, তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

ভাষিক শিল্পময়তাও এর একান্ত সাধনা। ফলে, একদিকে এই গদ্য প্রত্যক্ষ জীবনের সীমায় প্রতিমান অন্বেষণ করায় হয়ে ওঠে সংজ্ঞাপন-সহজ শিল্পবাণীতে সমৃদ্ধ; অপরদিকে সূক্ষ্ম শব্দজালে সে ধারণ করে শিল্পবোধের অতলান্ত অনুভব। উপন্যাসের গদ্য যেহেতু সামাজিক মানবের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক পরিধিকে বাণীরূপ প্রদান করে সেহেতু যাবতীয় মানবিক (humanitarian) ও জৈবিক (instinctive) সংবেদনাই এর বিচরণসীমার অন্তর্গত। কিন্তু, উপন্যাসের সামগ্রিক মানবজীবন কবিতার মতো স্রষ্টার বোধি ও ভাবনায় আবৃত হয়ে প্রকাশ পায় না; বরং বস্তুপরিবেশ-শাসিত বিভিন্ন চরিত্রের আপেক্ষিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে রচয়িতা ও চরিত্রের মধ্যে একটি চলমান ঋজু যোজকরেখা স্থাপন করে। অর্থাৎ, কবিতায় যেখানে কবির চৈতন্য ও শিল্পীস্বভাবেরই অখণ্ড প্রতিষ্ঠা, সেখানে উপন্যাস সময় ও সমাজ সংলগ্নতায় আখ্যান ও চরিত্রের মনোস্বভাবকে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় সমীকৃত করতে প্রত্যাশী। তবে এই ব্যবধান সত্ত্বেও কবিতা এবং উপন্যাস নিরন্তরভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

> But poetry has as much to learn from prose as from other poetry. And I think that an interaction between prose and verse, like the interaction between language and language, is a condition of vitality in literature. (Eliot; 152:1975)

ভাববিন্যাস-কৌশলের এ ভিন্নতায় উপন্যাসের প্রকরণকলা বহু কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্র অবয়বে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, উপন্যাসের শব্দশৈলী, আঙ্গিক পরিচর্যাসহ উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহারে এর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, বহুমানুষের মনস্তত্ত্বকে শৈল্পিকতার আলোকমালায় উজ্জ্বল করে তুলতে উপন্যাসের উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীককে হতে হয় সর্বাত্মক শোষণশক্তির অধিকারী। আর এর মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক-গদ্য ধারণ করে কখনো উপমিত মানব জীবন, চিত্রকল্পময় চেতনাপ্রবাহ কখনো-বা প্রতীকী জীবনস্বরূপ।

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক মূলত সংশ্লিষ্ট সাহিত্যশরীরে ব্যাপৃত বিবিধ চিহ্নের[১] (sign) সমষ্টি, যাদের অবস্থান প্রায়শ আপাত-প্রচ্ছন্ন, সংগুপ্ত। বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে এরা রচয়িতার অন্বিষ্ট কাহিনীকাঠামো এবং চরিত্রায়ণ কৌশলের অন্তর্লীন স্রোতে নিমজ্জিত থেকে বিশিষ্ট সংহিতার (code) অভিব্যঞ্জনায় সুনির্দিষ্ট ও বহুমাত্রিক চিহ্নায়ন (signification) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। একইসঙ্গে, উপন্যাসকে রীতিগত মানদণ্ডে শিল্পসার্থক করে তুলতেও এ সকল উপকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম। এ কারণে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্ব আলোচনায় এর চিহ্নায়ন-সামর্থ্য বিশ্লেষণ যেমন গুরুত্ববহ, তেমনি এর শৈলীবৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব নিরূপণও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ সকল বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশের পূর্বে উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক বিষয়ে মৌল ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন।

---

১ '... a sign is "anything which determines something else (its *interpretant*) to refer to an object to which itself refers (its *object*) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so *ad infinitum*". This definition shows the three elements of signs involve: the *sign* itself, the *object* and the *interpretant*, *which may in itself function as a sign*.' (Veivo; 36:2001)

Dhaka University Institutional Repository

উপমা

আলঙ্কারিক মত অনুসারে দুটি ভিন্নপ্রকৃতির বস্তুর মধ্যে গুণগত বা ক্রিয়াগত সাদৃশ্য সংস্থাপনের মাধ্যমেই উপমা[১] জন্মলাভ করে। বলা যেতে পারে, 'দুই পরস্পর-অসম্বন্ধী বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ফলে যে চমৎকৃতি তা-ই উপমা অলঙ্কারের বিষয়' (ক্ষুদিরাম দাস, ৫৬:১৯৯৪)। উপমায়, কোন বিশিষ্ট ভাব ও বস্তু আপাত সম্বন্ধবিহীন শব্দানুষঙ্গের তুলনাজ্ঞাপক দ্যোতনায় প্রচল তাৎপর্য থেকে রূপান্তরিত হয়ে নতুনতর বোধে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ, উপমা সৃজন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা একের আকরণ-গভীরে অপরের ধর্মকে (property) তুল্যমানদণ্ডে ধারণ করে। প্রধানত, চতুরঙ্গের আশ্রয়ে উপমা বিকশিত হয়। এ চারটি অঙ্গ হল : উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ। এই অঙ্গসমূহের সবকটি কিংবা কোনো কোনোটি ব্যবহার করে শিল্পী তাঁর অন্বিষ্ট বোধের অভিব্যঞ্জনা ঘটান। কিন্তু অলঙ্কারের সীমায় উপমার শিল্পশক্তি অবসিত হয় না, বরং সমগ্র রচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিন্দুতে সিন্ধু-সঞ্চারী অভিব্যক্তির আশ্রয়ে মানব চেতনাতল স্পর্শের মাধ্যমে তার নান্দনিক সৌকর্যের পূর্ণতা সাধিত হয়। উপমার প্রাণশক্তি মূলত নিহিত থাকে রচয়িতার কল্পনা ও অভিজ্ঞতার জগতে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

> The best part of human language, properly so called, is derived from reflection on the acts of the mind itself. It is formed by a voluntary appropriation of fixed symbols as *internal* acts, to process and results of imagination. (Coleridge; 39-40:1969)

কেননা, স্রষ্টার জীবনানুভবের রসে সিক্ত হয়েই এর জৈবসমৃদ্ধি ঘটে; চারু-সজ্জায় বিকশিত হয় তার ভাষিক অবয়ব। প্রকৃতপক্ষে, উপমা স্বকীয় সৃজনবৈশিষ্ট্যে সাহিত্যকে প্রদান করে রসসমৃদ্ধ নান্দনিক উৎকর্ষ। ফলে, সাহিত্যের ভাষা-পরিসরে সঞ্চারিত হয় শৈল্পিক ঔজ্জ্বল্য। তবে, উপন্যাসের পটভূমিতে রচয়িতার এ মনসিজ বোধ ও কল্পপ্রেরণা বিবিধ চরিত্র ও ঘটনার অন্তঃস্রোতেই ক্রমপ্রবাহিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দ এবং শব্দসজ্জার মধ্য দিয়েই রচয়িতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভাবকে কাহিনী এবং চরিত্রায়ণ কৌশলে ধারণ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দমালা কেবল স্রষ্টার মনোবিশ্বকেই প্রতিফলিত করে না, যুগপৎভাবে উপন্যাসের আঙ্গিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও একটি পরস্পরিত সম্পর্ক সৃজন করে। এ সম্পর্কে ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেন:

> '...in the novel the emotional associations attach not to words but to the moving current of mock reality symbolised by the words.' (Caudwell, 225-226:1937)

এ কারণে কথাসাহিত্য বিশেষত উপন্যাসের উপমাজগৎ অনিবার্যভাবেই বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতি আশ্রয় করে বিবর্ধিত হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় উপমা সৃজনের সূত্র ধরে ক্রমশ গড়ে

---

[১] Simile: a figureof speech involving the comparison of one thing with another of a different kind, as an illustration or ornament. (Pearsall, Judy and Trumble, Bill, 1351: 1996)

Dhaka University Institutional Repository

তুলতে আগ্রহী হন এক বোধিদীপ্ত ভাববিশ্ব; যেখানে তিনি নির্বাচিত উপমানের সাহায্যে কখনো বিশ্লেষণ করেন চরিত্রের মনোকাঠামো, কখনো-বা উপমান বৈচিত্র্যে রূপায়িত করেন বস্তুপরিপ্রেক্ষিত, ইঙ্গিতময় ভবিষ্যৎ অথবা বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার আন্তঃসম্পর্ক। লক্ষণীয় যে, উপমার বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ই রচয়িতার অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আহরিত হয়। কিন্তু একটি সার্থক উপমার শিল্প-অবয়ব কেবল অভিজ্ঞতার শব্দ-প্রতিবিম্বে পূর্ণতা লাভ করে না। বরং, স্রষ্টার মনীষা-উৎসারিত নান্দনিকবোধ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ব্যতিক্রমী শিল্পভাষায় তা রূপায়িত হয়। কথাসাহিত্যিকের অবলম্বনকৃত এ বিশিষ্ট ভাষা সৃজনের প্রধানতম শর্ত নিগূঢ় পরিমান-সুষমা ও সংহতিচেতনা। গাণিতিক পরিভাষার সাদৃশ্যে বলা যায় যে, স্বল্পশব্দবিস্তার অথচ ব্যাপ্তব্যঞ্জনা সঞ্চার এই দুয়ের ব্যস্তানুপাতেই (inverse ratio) উপমা ভাষাকে প্রদান করে শৈল্পিক উচ্চতা। সেইসঙ্গে, সাহিত্যিকের অনুভব, চিন্তন এবং অভিজ্ঞতার বাণীরূপ প্রদানের সূত্র ধরে উপমার মাধ্যমে ভাষা প্রাণিত হয় নতুন অর্থদ্যোতনায়। সার্থক উপমার অন্বিষ্ট হলো এই নতুন অর্থকে বহুমুখী ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলা। আর এরই মধ্য দিয়ে উপন্যাসের চলমান ঘটনা-বিন্যাস এবং পরিণতির ধারা হয়ে উঠে নন্দন-নিবিড় ও স্বাতন্ত্র্য-নির্দেশিত। অভিন্ন সমাজ ও বস্তুপ্রেক্ষাপটের অবলম্বনে রচিত হয়েও উপমাসহ বিভিন্ন শিল্প-উপকরণের প্রায়োগিক ভিন্নতায় দুটি উপন্যাসের পাঠকৃতিতে প্রতীয়মান হতে পারে মেরুদূর পার্থক্য। কেননা, উপমার মতো অন্যান্য সাহিত্যিক শিল্প-উপকরণেরও রয়েছে নিজস্ব অর্থসৃজনী ক্ষমতা। যদিও এদের প্রত্যেকের ব্যবহার-কৌশল ভিন্ন, কিন্তু এরা সকলেই বহুমাত্রিক অর্থসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসকে দান করে নান্দনিক সমৃদ্ধি।

উপমা যেহেতু উপন্যাসের অন্যতম সৃজনশীল শিল্প-উপকরণ, সেহেতু ঔপন্যাসিক-ভাষার শব্দসংগঠনের অন্তঃস্রোতে সঞ্চালিত বাস্তবতার শিল্প-বিন্যাস অনেকাংশেই এ ধরনের প্রসাধন কৌশলের যোগ্য ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। স্মরণ করা যেতে পরে, উপন্যাস যে আবেগসমষ্টিকে ধারণ করে তারা আপাতভাবে শব্দসূত্রে গ্রথিত হলেও, মূলত এক কল্পবাস্তবতার প্রতিরূপক সৃজনই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> 'reality is structured by the novelist not only in the particular characters, events, and objects in which he represents it, but initially in the words and arrangements of the words with which he creates these characters, events, and objects.' (Lodge, 18: 1984)

এই শিল্প-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঔপন্যাসিক নির্বাচন করেন তাঁর নিজস্ব উপমান জগৎ। তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত চরিত্রসমষ্টিকে সুনির্ধারিত কাহিনীসূত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করবার লক্ষ্যে কখনো-কখনো নির্বাচিত উপমান সহযোগে সৃজ্যমান উপমায় প্রদান করেন ক্রিয়াবাচকতা। কখনো-বা বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াবিশেষণরূপে উপমার প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি স্পষ্ট করে তোলেন সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপবৈশিষ্ট্য এবং কাহিনী ও পরিবেশের বস্তুপরিপ্রেক্ষিত। সেইসঙ্গে, বাক্যিক বিবিধ অনুষঙ্গের সম্পর্ক

A simile is a 'figure of speech that, like metaphor, compares unlike things in order to describe something. Similes do not state that something is another thing, however. Instead, they compare using the word "like" or "as." (Source: www.about.com.)

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্নির্ণয়ের কৌশলরূপে উপমার প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুচারুরূপে বিন্যাস করতে সচেষ্ট হন। ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত এ সকল ভাষাতাত্ত্বিক কৌশলের অবতারণায়, রচনার উপমা ব্যবহার অধিকতর নিখুঁত ও সুনিপুণ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, উপযুক্ত উপমার সুনিপুণ প্রয়োগ উপন্যাসের সৃষ্টি কৌশলে যোজনা করে মেধাবী মাত্রা।

চিত্রকল্প

চিত্রকল্প, সৃষ্টিশীলপ্রজ্ঞার বোধের জগতে সৃজিত, ভাষিক-স্থাপত্যে রূপায়িত শিল্প-সংকেত। কবিতার রসাবেদন সঞ্চারে এর ভূমিকা ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক। মানব জীবনসমগ্রকে আত্মস্থ করবার যে প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের মৌল প্রবণতা, তাকে ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণতা দিতে মহৎ কবির মতো ঔপন্যাসিকও অনাস্বাদিতপূর্ব চিত্রকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপন্যাস-স্রষ্টার মানসধর্মের নিকটতম শব্দদূত এই চিত্রকল্প, নিজস্ব ব্যঞ্জনায় উদ্দীপিত করে পাঠকের সংবেদী কল্পনা; পাঠকৃতির অন্বিষ্ট আবেদনে সঞ্চালন করে নিগূঢ় নান্দনিকতা। বলা যায় যে, 'প্রতিটি ইমেজ [চিত্রকল্প] যেন ইম্যাজিনেশনে পৌঁছবার রাস্তা' (অমলেন্দু বসু, ৭: ১৯৭১)। সৃষ্টিশীল চেতনার এই চিরসবুজ পথের সৃজন-সূত্র নির্ধারণকল্পে *The poetic image* (1947) গ্রন্থে সি ডি লিউইস যে তিনটি মৌল বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন তা হল— 'freshness', 'intensity', এবং 'evocativeness'। অর্থাৎ, শব্দসীমায় অসীমতা-সঞ্চারী সমুদ্র-গভীর অনন্যতা কোনো সার্থক চিত্রকল্প সৃজনের পূর্বশর্ত। এর উৎসমূলে নিহিত থাকবে সাহিত্যস্রষ্টার ইন্দ্রিয়-আস্বাদিত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সংবেদনা অথচ রসগ্রাহী পাঠকের চিত্তে তা ইন্দ্রিয়-উত্তীর্ণ মনসিজ ভাবনার চিত্রময়ী বিমূর্ততায় অভিদ্যোতিত হবে । অর্থাৎ, যে কোনো চিত্রকল্প পাঠকের রসাস্বাদন এবং 'বিস্ময়াচ্ছন্ন আনন্দসম্ভোগ'-এর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। এই অনির্বচনীয় অনুভূতির ফলে 'পাঠকচিত্তে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়: এক, শিল্পরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়; দুই, বুদ্ধি পথ খোলাসা ক'রে দিলে পরে সে-অবারিত দ্বারে পাঠকের কল্পনাশক্তি কবির [শিল্পস্রষ্টা অর্থে] কল্পনাশক্তির সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করে। বুদ্ধি ও কল্পনার সামান্যার্থ ও অসামান্য জ্ঞাপনার এই সমন্বয়ে ভাষার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়' (অমলেন্দু বসু, ৭০: ১৯৭২)। বলা যায় যে, এই শিল্প-উপকরণ শব্দের ছদ্মবেশে সাহিত্যিক তথা উপন্যাস রচয়িতার আবেগী অভিজ্ঞতার ভরকেন্দ্রগুলিকে পরস্পরিত ও রহস্যময় উদ্দীপনায় শিহরিত করে পাঠকের হৃদয়ে রসোপভোগের অনুভতি জাগায়। অন্যভাবে বলা যায় যে,

> An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. (Pound; 321:1966)

অর্থাৎ, স্থান-কালের পরিসরে রচয়িতা তাঁর পারিপার্শ্বিক বস্তুকাঠামোকে 'কীভাবে দেখছেন, তদাপেক্ষা কীভাবে অনুভব করছেন,... চিত্রকল্প সেই তাৎপর্যের সন্ধান দেয়' (সরোজ বন্দ্যোপাধায়, ১১: ১৯৮৪)। তাই কখনো-কখনো নবীন শব্দানুষঙ্গের অনিবার্য ব্যবহার উপেক্ষা করে প্রায়োগিক প্রাতিস্বিকতার কারণে চিত্রকল্প বিস্তার করতে পারে অ-পূর্বত্বের দ্যোতনা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে কোনো একটি রসময় চিত্রকল্প সৃজনে লেখকের চিন্তাবিশ্বের গঠনশৈলী তথা তাঁর সৃজনী-চেতনার প্রকৃতি কীরূপ

Dhaka University Institutional Repository

তা নিরূপণ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্রকল্প যেহেতু ইন্দ্রিয়-আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের আভাস জাগায়, সেহেতু এর অনুধাবনে লেখকের পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যবহাররীতি, ইন্দ্রিয়-বিপর্যাস[১] (synaesthesia) সংঘটনের প্রবণতা, বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় অনুভবের প্রতি শৈল্পিক দুর্বলতা— এ সকল কিছুই নিগূঢ় দৃষ্টিতে বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা, অন্বিষ্ট চিত্রকল্পের অনুভব-কেন্দ্রে কোন প্রক্রিয়ায় দৃশ্য, ধ্বনি, ঘ্রাণ, স্বাদ কিংবা স্পর্শের সংবেদনা একক কিংবা যুগ্মভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে তার বিশ্লেষণ একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট চিত্রকল্পকে অনুধাবনে ও তার রসাস্বাদনে সহায়তা করে, তেমনি স্রষ্টার মনোনির্দেশনার প্রকৃতিও অনেকাংশে স্পষ্ট করে তোলে। বিশেষত, চিত্রকল্প-স্রষ্টা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুপরিমণ্ডলে আন্তঃইন্দ্রিয় বিপর্যাস ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত ভাবসম্পদকে নান্দনিক উচ্চতায় বিশিষ্ট করে তোলেন, তখন সেই সংকেতিত অনুভবরাশির মর্মমূল স্পর্শ করতে হলে প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

চিত্রকল্পে শিল্পীর ভাববিশ্ব আলঙ্কারিক ভাষায় উপস্থাপিত হওয়ায় কখনো একক ভাব, কখনো-বা ভাবপুঞ্জ সম্মিলিত প্রয়াসে সৃজন করে এর অবয়ব। ফলে, রচনার পাঠকৃতিতে এই শিল্প-উপকরণ কখনো রচয়িতার নান্দনিক অনুভববিশ্ব ও কাঙ্ক্ষিত মনোভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়; কখনো আবার বিশেষ কোনো চিত্রকল্পে অনুরণিত হয় পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় রসাবেদনের স্বরবৈভব। প্রসঙ্গত চিত্রকল্পের বিচিত্রতা সন্ধানে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুচ্ছ লক্ষণীয়:

> ... আমরা লক্ষ করছি যে কতগুলি বিভিন্ন প্রতিমার চূড়ান্তে একই ভাবজগত, তারা সবাই মিলে এক ভাবনারই ইশারা দিচ্ছে। ...এহেন তুল্য ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত বাক্‌প্রতিমাকে [চিত্রকল্প] ইংরেজ ও জার্মান লেখকগণ বলেন Image cluster, আমার প্রস্তাব আমরা বলব প্রতিমাপুঞ্জ। ... সচরাচর বাক্‌প্রতিমা স্বসম্পূর্ণ হয়ে থাকে ... একটি বিশেষ প্রতিমায় ... কিন্তু প্রতিমাপুঞ্জে একটি বিলম্বিত ভাবনা নানা কবিতায় নানা উপমানে বিস্তার লাভ করে। ... বাক্‌প্রতিমার শারীর রূপ বদলাচ্ছে, কিন্তু তাদের মর্মমূলে একই ভাবনা নিহিত। একেই বলি প্রতিমাপুঞ্জ।
>
> অন্য এক শ্রেণীর প্রতিমাও উল্লেখ করা দরকার : chain imagery। আমার প্রস্তাব এহেন প্রতিমাকে বলব প্রতিমা শৃঙ্খল, যেক্ষেত্রে এক প্রতিমার বিশেষ ইন্দ্রিয় সংবেদনা থেকে পরক্ষণেই পাঠকচিত্ত অপর প্রতিমার অন্য ইন্দ্রিয় সংবেদনার পানে ধাবিত হয়, এমন কি একই সঙ্গে তিন চারটি অথবা তদধিক প্রতিমায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সংবেদনার সমন্বয় হয়ে যায়। (অমলেন্দু বসু, ৩৫-৩৭: ১৯৭১)

অর্থাৎ, চিত্রকল্পে নিহিত থাকে এক কিংবা বহুভাবের সংবেদনা-সঞ্চারী সংহিতা; যাকে অবলম্বন করে পল্লবিত হয় এই শিল্প-উপকরণের ব্যবহারগত বৈচিত্র্য। কিন্তু লেখক-পাঠকের 'বিনি সুতার' নন্দন-গাঁথায় কেবল যোগ্যতম সংহিতা বা সংহিতাগুচ্ছই নির্দিষ্ট চিত্রকল্পে রূপায়িত হয়। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়

---

[১] 'ইংরেজিতে 'সিনেসথেসিয়া' (synaesthesia) মূল গ্রিক শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'একসঙ্গে দেখা'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধ বা অনুভূতি আর-এক ধরনের বোধ বা অনুভূতির ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য মনে হয়। যেমন 'রং'কে 'উষ্ণ' বলা, 'শব্দ'কে 'মসৃণ' বলা।' (তথ্যসূত্র: সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়; ২৪:১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

যে, শিল্পীর মনোনির্দেশনা এবং সহৃদয় সামাজিকের রসাস্বাদন সামর্থ্য চিত্রকল্পের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণ করে। তাই, রূপগত বৈচিত্র্যে এই শিল্প-উপকরণ বিশ্বব্যাপী অগণ্য শিল্পস্রষ্টা ও পাঠকের সমানুপাতী। তবে, সার্থক চিত্রকল্পে কখনোই কোনো সংহিতা-সূত্র আরোপ করা যায় না; নিজস্ব গঠনশৈলীর সুচারুতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এরা জন্ম নেয়; এতে সঞ্চারিত হয় অকৃত্রিম বহুমাত্রা। বহুত্বকে আত্মস্থ করবার সহজাত আকাঙ্ক্ষায় চিত্রকল্প সৃজনে ব্যবহৃত হয় আলঙ্কারিক ভাষার বিবিধ উপকরণ। এ কারণে চিত্রকল্প বিচ্ছিন্ন কিংবা সম্মিলিতভাবে একদিকে যেমন উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসহ কখনো-কখনো শব্দালঙ্কারকেও নিজ অস্তিত্বে ধারণ করে, তেমনি প্রতীক কিংবা রূপকও অনায়াসে এর গঠনকৌশলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে, চিত্রকল্প কেবল ভাবসম্পদকেই শিল্পান্বিত করে না, বিচিত্র শিল্প-উপকরণকেও নিজ রহস্যাবৃত জঠরে আত্মস্থ করে।

প্রকৃতপক্ষে, চিত্রকল্প উপন্যাসের এক অবিচ্ছেদ্য শিল্প-উপকরণ। যে কোনো সৃষ্টিশীল রচনার কেন্দ্রে সমন্বিত ভাব ও বোধের সুষুপ্ত সমুদ্র মন্থন করে অমৃতসঞ্চারী ব্যঞ্জনায় তা রসগ্রাহী পাঠকের কাছে আস্বাদনযোগ্য করে তুলতে চিত্রকল্প পালন করে অনন্য ভূমিকা।

প্রতীক

বিমূর্ত বোধ এবং বস্তু-পরিবেশের আপেক্ষিক সম্পর্কের অন্তর্লীন গহ্বর থেকে জন্ম নেয় প্রতীক। সাহিত্যে ভাবপ্রত্যয় সৃষ্টির অন্যতম বাহন এই প্রতীক শিল্পীর বহুস্তরী ভাবনার কেন্দ্রমূল অবলম্বনে ভাষিক অবয়ব প্রাপ্ত হয়। বস্তু ও ভাবের আপাত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে অভেদ কল্পনা, কিংবা সংশয়ী-বক্তব্যের অন্তরালে কোনো সুদূর-সঞ্চারী সংবেদনাকে অনুরণিত করবার মধ্য দিয়ে যেখানে রূপকের (metaphor এবং allegory উভয় অর্থে) পূর্ণতা, সেই দ্বিমুখী স্তরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আবেগ ও মননের সাযুজ্যে বহুভাবের জৈব-সংশ্লেষে এক তৃতীয় শিল্পস্তরে সৃজিত হয় প্রতীক। অর্থাৎ, আলঙ্কারিক ভাষার বস্তু কিংবা ভাব নয়, বরং এদের স্বতঃপরিবর্তনশীল আন্তঃসম্পর্কগুচ্ছের প্রতিফলন বিন্দুতে নিজস্ব স্থান অন্বেষণ করে এই ব্যতিক্রমী শিল্প-উপকরণ। এ কারণে প্রতীককে আখ্যা দেয়া যায় 'a focus of relationship' রূপে, যেখানে পরস্পরিত ও সহচারী সংস্পর্শে বস্তুবিশ্ব এবং ভাবসমুদ্র উপন্যাসের পাঠকৃতিতে অভিন্ন দিগন্তরেখায় মিলিত হয়। অর্থাৎ, সাহিত্য তথা উপন্যাসের কোনো ভাষিক উপকরণ তখনই প্রতীকের মর্যাদা অর্জন করে, যখন তা সকল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে নিজস্ব মূল্যবোধে এক সম্পূর্ণ অভিব্যঞ্জনা প্রকাশের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাসে প্রতীক মূলত সংকেতিত করে কোনো ঘটনা কিংবা চরিত্রের অভিব্যক্তির আপেক্ষিক অবস্থান; যাকে কেবল মনন-দ্যোতনায় আবিষ্কার এবং আত্মস্থ করা সম্ভব। সুতরাং প্রতীককে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এভাবে:

> অনেক ধারণা, অনেক অভিজ্ঞা, অনেক ইন্দ্রিয় সংবেদনা ও অনুভূতি যেন কালক্রমে কবির [সাহিত্যিক অর্থে] সৃজনীচিত্তে সংগোপনে থিতিয়ে গিয়ে যে শিল্পরূপ ধারণ করেছে তাকেই বলতে পারি প্রতীক। (অমলেন্দু বসু, ৮৬: ১৯৭২)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক যেহেতু বহু সম্পর্কের সংযোগ-কেন্দ্র, সেহেতু তা বিশেষের মধ্যে ব্যাপ্তকে ধারণ করে আবার একের আলোয় অন্যকে আলোকিত করে। ফলে প্রতীকে বস্তুর সঙ্গে সত্তার নিগূঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এক অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে উপন্যাসের অন্তর্দেশে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে, কোলরিজের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> A symbol is characterized by the translucence of the special in the individual, or of the general in the special, or of the universal in the general; above all by the translucence of the eternal through and in the temporal. It always partakes of the reality which it renders intelligible; and while it enunciates the whole, abides itself as a living part in that unity of which it is the representative.... It is very possible that the general may be working unconsciously in the writer's mind during the construction of the symbol. (তথ্যসূত্র, অমলেন্দু বসু, ৯০: ১৯৭২)

বৈচিত্র্যকে আত্মস্থ করবার যে সহজাত বৈশিষ্ট্য প্রতীকের মধ্যে সদা প্রবহমান, তার ধারাবাহিকতায় কখনো প্রচ্ছন্নভাবে কখনো আংশিক প্রতীক-আভাসে কখনো-বা কেন্দ্রীয়ভাবে বিশেষ কোনো প্রতীকের কেন্দ্রমূল স্পর্শ করে জন্ম নেয় কোনো রচনার শিল্প-অবয়ব। আবার, পাঠকৃতির অন্তর্গত বিশেষ অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিক আগমনও প্রতীকের জন্ম দিতে পারে; যার মধ্য দিয়ে অভিব্যঞ্জিত হয় সংশ্লিষ্ট রচনার প্রধানতম সুর ও রচয়িতার মানস-প্রবণতা। উপন্যাসসহ যে কোনো সাহিত্যকর্মে প্রতীকের প্রায়োগিক পরিধি এবং ব্যঞ্জনাগত গভীরতার এই তারতম্য মূলত শিল্পীর মনোসংবেদনা এবং অন্বিষ্ট বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে অভিদ্যোতিত হয়। ফলে, এই শিল্প-উপকরণ বিশেষ আবহে পাঠকৃতির গতিপ্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে। বলা যেতে পারে, উপন্যাসের পাঠকৃতিতে প্রতীকের হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া কখনো-কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো-বা যূথবদ্ধ। অর্থাৎ, শিল্পী কখনো কেবল আলঙ্কারিক ভাষার বহিরাবরণে প্রতীকতা সঞ্চার করে তাঁর কাঙ্ক্ষিত চরিত্র কিংবা কাহিনী-অংশকে পাঠকের সামনে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিবিধ প্রতীকের মধ্যে কোনো অন্তর্গূঢ় ঐক্য কিংবা পারস্পরিক সংযোগ না থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, রচয়িতার আচরিত চিন্তাধারা এ-ক্ষেত্রে অ-প্রতীকী; কেবল বিশেষ প্রয়োজন সাধনে তাঁর প্রতীকাশ্রয়ী হবার আগ্রহ বিদ্যমান। কিন্তু, রচয়িতা যখন সচেতনভাবে এক নির্বিকল্প প্রণোদনায় আপন সৃজনীশক্তিকে প্রতীকপন্থার সঙ্গে অভিন্ন ধারায় বাহিত করেন, তখন প্রতীক হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট রচনার কেন্দ্রীয় মুখপাত্র। ফলে, সেই মূলাশ্রয়ী প্রতীকের প্রয়োগ-রহস্য উদ্ধার ব্যতীত কোনোভাবেই ওই সাহিত্যকর্মের নান্দনিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং, বিশ্লেষণীয় পাঠকৃতিতে প্রতীকতা আছে কি না এবং এর প্রকৃতি কীরূপ তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সঠিক নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

২

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের গঠনবিন্যাস বিশ্লেষণে চিহ্নবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কোনো নির্দিষ্ট শিল্প-উপকরণের অন্তরালবর্তী ভাববিশ্ব যা বিশেষ বাগর্থ পরম্পরায় ভাষা-কাঠামো বা চিহ্নায়ক দ্বারা চিহ্নায়িত হয়, তাকে অনেকান্তিক ব্যঞ্জনায় সংদ্যোতিত করবার মধ্য দিয়েই চিহ্নবিজ্ঞান[১] নন্দনতত্ত্বকে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। সোস্যুরীয় মতানুসারে, বিশেষ প্রতিবেশে জন্ম নেয়া চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িত-এর পারস্পরিক সম্পর্ক আপতিক (arbitrary) এবং এরা কেউই চিহ্নের দ্যোতনাবাহী সংশ্লিষ্ট পার্থিব বস্তুকে গঠন করে না; বিশেষ সংস্কৃতির সীমায় পারস্পরিক সহযোজনায় (association) এরা উক্ত বস্তুটির এক বা একাধিক অনুভববেদ্য বিশ্লেষণ করে থাকে। অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিরাজিত প্রতিটি চিহ্নের অবস্থান ও পরিচয় আপন স্বাতন্ত্র্যে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, অন্য সকল চিহ্ন থেকে পৃথক বলেই কোনো একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এরূপ স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় তার চিহ্নায়ন-সামর্থ্য (দ্র. সোস্যুর, ১১৮:১৯৫৯)। অপরদিকে বিশিষ্ট দার্শনিক এবং চিহ্নবিজ্ঞানী সি এস পার্সের মতে, বস্তু এবং চিহ্নের সম্বন্ধ সৃজিত হয় বস্তু-ভাষ্যকারের (interpreter) মস্তিষ্কে; যাকে তিনি অভিহিত করেছেন বস্তু-ভাষ্যপ্রবণতা (interpretant) হিসেবে। তাঁর অপর তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, বস্তু-ভাষ্যপ্রবণতার সাহায্যে কিংবা অনুকল্প-সৃজনী প্রক্রিয়ার[২] (abductive inference) প্রয়োগ-নির্দেশনায় নিরূপিত চিহ্ন চূড়ান্তভাবে নিগূঢ় অর্থসঞ্চারী অসীম চিহ্নতার[৩] (unlimited semioses) দিকে ধাবিত হয় (দ্র. ইকো, ১৯৩:১৯৭৯)। বলা যেতে পারে, সংহিতা-সঞ্চালনের মাধ্যমে বস্তু-ভাষ্যকারদের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নের কাঠামোকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এই কাঠামোর সজ্ঞা ব্যাখ্যায় চিহ্নবিজ্ঞানে দুটি পরিভাষা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এদের একটি হল প্যারাডাইম, যাকে বিশ্বব্যাপী অশ্রেণীকৃত (non-ordered) বিবিধ চিহ্নের গুচ্ছসংকলনরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। অপরটি হল সিনট্যাগম, যার মূল বৈশিষ্ট্য হল সুনির্বাচিত ও অখণ্ড অর্থসৃজনী একদল চিহ্নকে শ্রেণীবদ্ধ (ordered) শৃঙ্খলায় বিন্যাস করা। অর্থাৎ উপাদান নির্বাচন বা প্যারাডাইম এবং তার সুশৃঙ্খল সংযোজন বা সিনট্যাগম এর সহযোজনায় যথাক্রমে প্যারডিগম্যাটিক সম্বন্ধ এবং সিনট্যাগম্যাটিক সম্বন্ধ সৃজনের মাধ্যমে চিহ্ন ব্যাখ্যার সামগ্রিক

---

১ 'The term *semiotic* was coined at the close of the nineteenth century by the American philosopher Charls Sanders Peirce to describe a new field of study of which he was the founder, and *semiotics* traces its decent from this point. *Semiology* was coined by the Swiss linguistician Ferdinand de Saussure, and in his posthumously edited and published *Course in General Linguistics* he defended the coinage as necessary for the naming of that new science which would form part of social psychology and would study 'the life of signs within society' (1974, 16)...

What is certain is that, between the 1960s and the 1980s, attempts to establish a unified science of signs known as *semiotics* flourished, and that this threw up an extended terminology and set of concepts that have been pressed into use in a very wide range of fields of study— including that of literary criticism. (Hawthorn; 314-315: 2000)

২ 'This is a term used by Peirce to refer to a form of inference (alongside *deduction* and *induction*) by which we treat a signifier as an instance of a rule from a familiar code, and then infer what it signifies by applying that rule.' (Chandler; 387:2002)

৩ 'This term was used by Peirce to refer to the process of 'meaning-making'. (ibid; 457:2002)

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। প্রথমটি বিশেষ প্রতিবেশে একগুচ্ছ সম্ভাব্য নমুনার মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান অন্বেষণ করে এবং দ্বিতীয়টি শনাক্তকৃত উপকরণসমূহকে বিশেষ কাঠামোয় সজ্জিত করে। অর্থাৎ, ঔপন্যাসিক-পাঠকৃতির সিনট্যাগম্যাটিক বিশ্লেষণ হল তাতে প্রোথিত সকল চিহ্নের ধারাক্রমিক সজ্জার বর্ণনা, অপরপক্ষে উক্ত পাঠকৃতির প্যারাডিগম্যাটিক বিশ্লেষণ হল অন্তর্গত চিহ্নসমূহের প্রকৃতি নির্দেশ এবং সার্বিকভাবে মানবমনস্তত্ত্ব এবং মানবসমাজের সাপেক্ষে সেগুলোর অবস্থানের ধারাক্রমিক ব্যাখ্যা প্রদান। সাহিত্যের পাঠকৃতিতে চিহ্নের এই নান্দনিক ব্যাখ্যাকে সুস্পষ্ট করতে বিশেষ গুরুত্বে বিবেচিত হয় বাচ্যার্থ (denotation) এবং ব্যঞ্জনার্থের (connotation) প্রায়োগিক তাৎপর্য। বাচ্যার্থ ব্যাখ্যা করে প্রাথমিক সজ্জার চিহ্নায়ন (first order signification), যেখানে চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িত-এর অর্থসম্বন্ধ (meaning) সরলরৈখিক (দ্র. ফিস্ক, ৮৫:১৯৯৭)। অর্থাৎ বাচ্যার্থ হল অর্থের আভিধানিক রূপ। অপরদিকে, ব্যঞ্জনার্থ হল দ্বৈতীয়িক সজ্জার চিহ্নায়ন (second order signification); যা নির্দেশ করে সহযোজিত (associated) অর্থের ব্যাখ্যান প্রক্রিয়া। ব্যঞ্জনার্থে তাই প্রোথিত থাকে বক্তা-ভাষ্যকারের অনুভব, মনোভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (দ্র. ফিস্ক, ৮৬:১৯৯৭)। চিহ্নের বাচ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনার্থকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেন রলাঁ বার্ত (১৯৭৭)। সাহিত্য যেহেতু বিচিত্র ব্যঞ্জনার্থের সমন্বয়-আধার সেহেতু বার্ত একে 'দ্বৈতীয়িক সজ্জার চিহ্নতন্ত্ররূপে' অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, 'চিহ্নবিজ্ঞান হল যুগ পরিসরে সামূহিক কল্পনার অভিব্যক্তি' (তথ্যসূত্র: তপোধীর ভট্টাচার্য, ৫৬: ১৯৯৮)। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য বিচিত্র আঙ্গিকে বিশ্বজাগতিক সকল কল্পনা ও চিন্তাকে বিবিধ মাত্রায় ধারণ করে। তাই চিহ্নবিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে এক সহজাত আন্তঃসম্পর্ক। বিশেষত উপন্যাসে মানবের জীবনসমগ্র রূপায়ণের দায়বদ্ধতা থাকায়, এর পাঠকৃতির চিহ্নবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কীভাবে এবং কোন কৌশলে সামূহিক বাচন (langue) ও একক বাচন (parole)[১]-এর সামষ্টিক ও ব্যক্তিক আন্তঃসম্পর্ক সমাজমনস্তত্ত্বে সক্রিয়তা পায় ও তা সাহিত্যের ভাষাকে কোন পন্থায় প্রভাবিত করে। ফলে, 'মানুষ পরিবর্তমান সময়ের অনুভব অনুযায়ী প্রতীক গড়ে তোলে এবং নিজেই নির্মিত প্রতীককে ভেঙে দেয়। এইজন্যে কোনো চিহ্নায়কই পুরোপুরি পুরোনো হয় না আবার নতুনও থাকতে পারে না' (তপোধীর ভট্টাচার্য, ৫৭: ১৯৯৮)। অর্থাৎ, বোধ-দীপ্ত ভাষার আশ্রয়ে উপন্যাস মানব-মন এবং সমাজের দোলাচলে উদ্দীপনা জাগায়, তার জঙ্গমতাকে চিহ্নায়নসূত্রে বিশ্লেষণ করে।

উপন্যাসের এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য পাঠকৃতি-বিন্যস্ত নান্দনিকতার সূত্রসন্ধান; যার একমাত্র পথ উপন্যাসের আলঙ্কারিক ভাষার[২] (figurative language) নানামাত্রিক বিশ্লেষণ। বলা যায় যে, আলঙ্কারিক ভাষা 'বাচনিকতায় অনির্বচনীয়কে ধারণের সামর্থ্য সংরক্ষণ করে' (হকস, ১:১৯৭৭)। ফলে

---

১ These are Saussure's terms. *Langue* refers to the abstract system of rules and conventions of a signifying system - it is independent of, and pre-exists, individual users. *Parole* refers to concrete instances of its use. (ibid; 420-21:2002)

২ Figurative Language is a departure from what users of the language apprehend as the standard meaning of words, or else the standard order of words, in order to achieve some special meaning or effect.... figurative language has been divided into two classes: (1) "Figures of thought," or tropes (meaning "turns," "conversions"), in which words or phrases are used in a way that effects a conspicuous change in what we take to be their standard meaning.... (2) "Figures of speech," or "rhetorical figures," or schemes (from the Greek word for "form"), in which the departure from standard usage is not primarily in the meaning of the words, but in the syntactical order or pattern of the words. This distinction is not asharp one, nor do all critics agree on its application (Abrams: 66:1993)

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাষার সুনিপুণ ব্যবহারে আভাসিত হয় উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যঞ্জনার্থ। মূলত, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আকরণবাদী (structuralist) ক্লদ লেভি-স্ত্রস, রোমান ইয়কবসন; প্রকরণবাদী (formalist) হেইডেন হোয়াইট; আকরণোত্তরবাদী (poststructuralist) জ্যাঁ দেরিদা, জ্যাঁ লিকান; বাগর্থবিদ (semanticsts) জর্জ ল্যাকফ, মার্ক জনসন প্রমুখ মনীষী নবীন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলঙ্কারিক ভাষা বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এক বিশেষ প্রত্যয়— যার সারার্থ হল আলঙ্কারিক ভাষা কেবল সাহিত্যিক ভাবসম্পদের পরিবেশনাকেই ধারণ করে না, তার গভীরতা ও বিস্তৃতিকেও পরস্পরিতভাবে প্রভাবিত করে। এই বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অন্তর্শক্তি প্রধানত লক্ষণা-সামর্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট ভাষিক অবয়বের ওপর নির্ভরশীল। লক্ষণা (tropes) [দ্র. পূর্বপৃষ্ঠা, পাদটীকা ২] মূলত ধারণ করে ভাষার অন্তর্দেশে সঞ্চালিত, ব্যঞ্জনার্থে সমৃদ্ধ বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, আলোচ্য উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক— সকল কিছুর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ এই লক্ষণার সীমায় আবর্তিত। চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে, উপন্যাসসহ সকল দ্বৈতীয়িক সজ্জার চিহ্নায়ন পাঠকৃতির অন্তস্তলস্পর্শী প্রণোদনার সঙ্গে সহযোজনাসম্বন্ধে (associative relation) সমন্বিত বলে লক্ষণা-সংশ্লিষ্ট সকল শিল্প-উপকরণ এই সহযোজনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে, গঠন করে আলঙ্কারিক ভাষার বোধসঞ্জাত বহুস্বরিক কাঠামো। সুতরাং বলা যায় যে, লক্ষণাশক্তিতেই ঔপন্যাসিক ভাষা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়। আলঙ্কারিক ভাষার মৌল প্রবণতা হল বিচিত্র সংহিতা সৃষ্টি; যা লক্ষণার আশ্রয়ে, প্রতিবেশ-প্রভাবিত বাস্তবতা ও অন্তর্শায়িত ভাবসম্পদের নান্দনিক মিথস্ক্রিয়ায় শিল্পসূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজিত উপন্যাসের ভাষিক অবয়ব (figures of speech) [দ্র. পূর্বপৃষ্ঠা, পাদটীকা ২] একের মধ্যে অন্যকে ধারণ করবার শক্তি অর্জন করে। উপন্যাসের আলঙ্কারিক ভাষায় লক্ষণা মূলত সঞ্চালিত করে রচয়িতার মনোবিশ্ব-উৎসারিত বিশিষ্ট বাস্তবতা। বস্তুবিশ্বের নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমৃদ্ধ, ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিশীল মনোসংবেদনাকে আত্মস্থ করেই লক্ষণা-নির্ধারিত বিবিধ শিল্প-উপকরণ পাঠকৃতিতে অভিব্যঞ্জিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণাগুণ-সঞ্চারী উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যঞ্জনাসামর্থ্য সামগ্রিকভাবে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ, সাহিত্য তথা উপন্যাসের পাঠকৃতিতে লক্ষণার অনুপস্থিতি যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি কোনো লক্ষণাকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা প্রদানও অসম্ভব। উপন্যাসের লক্ষণাগুণের সঙ্গে এর ভাষিক অবয়ববের গঠন কৌশল পর্যালোচনাও একান্ত আবশ্যক। এ দুইয়ের সমন্বয়ে, উপযুক্ত প্যারাডিগম্যাটিক ও সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জার আশ্রয়ে উপন্যাসের পাঠকৃতিতে উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিষয়টিকে যদি জ্যামিতিক প্রণালীর দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, চিহ্নের সিনট্যাগম্যাটিক এবং প্যারাডিগম্যাটিক সম্বন্ধ যথাক্রমে আনুভূমিক অক্ষ ও উল্লম্ব অক্ষের বিন্যাসে পাঠকৃতিতে অবস্থান করে; আর এদের পারস্পরিক প্রতিসাম্যই মূলত উপন্যাসে রসোদ্দীপনা জাগায়। সমগ্র বিষয়টিকে রোমান ইয়াকবসন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination. (তথ্যসূত্র: কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ৪২: ২০০৩)

এই উল্লম্ব অক্ষের সম্ভাব্য সজ্জাগুচ্ছ থেকে নির্বাচন করে আনুভূমিক অক্ষের সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে সঞ্চালনের মাধ্যমে আলোচ্য শিল্প-উপকরণ পাঠকৃতিতে লক্ষণার অনুষঙ্গী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, লক্ষণা

Dhaka University Institutional Repository

যথাসম্পর্কিত প্যারাডাইম এবং সিনট্যাগম-এর সহায়তায় চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িতের আন্তঃসম্পর্ককে ত্রুটিশূন্য শিল্পাঙ্গিকে সমন্বিত করে। বিশিষ্ট নন্দনতাত্ত্বিক সিলভারম্যান একে ব্যাখ্যা করেছেন, 'orchestrate the interactions of signifiers and signified'-রূপে (সিলভারম্যান, ৮৭:১৯৮৩)। এরূপ সমগ্রতাস্পর্শী চিহ্নায়ন ব্যবস্থাপনায় উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক পাঠকৃতি-সাপেক্ষে স্ব স্ব চিহ্নায়ক এবং চিহ্নায়িতের আন্তর্যোজনায় নতুন চিহ্ন সৃজনে সক্ষম। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার এই বহুলাঙ্গ বৈশিষ্ট্য শিল্প-সার্থক উপন্যাসে সঞ্চার করে কালোত্তীর্ণতার দ্যোতনা, চিরায়ত গ্রহণযোগ্যতা।

লক্ষণা-অন্তর্গত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক, একদিকে ধারণ করে কোনো সাধারণ ভাব (tenor), অপরদিকে ব্যবহার করে কোনো বিশিষ্ট বাহন (vehicle)। এই সাধারণ ভাব এবং বিশিষ্ট বাহনের আপাত বৈসাদৃশ্য কিংবা সম্পর্কহীনতার মধ্যেই বিস্তৃত হয় আলঙ্কারিক ভাষার লক্ষণা পরিস্রুত অভিব্যঞ্জনা। এ ব্যঞ্জনাময় রহস্যাবৃত ভাবজগৎকে চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব ভঙ্গিমায় ব্যাখ্যা করে; আলঙ্কারিক ভাষার পূর্ণাঙ্গ অর্থ উপলব্ধির জন্য লেখক-পাঠকৃতি-পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি-প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে এক বিশিষ্ট সহসম্পর্ক (correlation)। বিশেষত, পাঠক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বোধির সমন্বয়ে একটি আপেক্ষিক অবস্থান থেকে আলঙ্কারিক ভাষার অন্তস্তলশায়িত চিহ্নপুঞ্জ বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত হেরি ভিইভো এর মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> 'Literary texts are open to indeterminacy in several aspects. The information indicated by the text must be supplemented and complemented by the knowledge of the reader derives from his or her own experiences'. (Veivo, 73: 2001)

ফলে, পাঠকৃতি প্রথাসিদ্ধ (conventional) প্রতিবেশে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক এবং সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপন করে বিশিষ্ট সম্বন্ধের সেতুবন্ধন। এই সম্পর্কের গভীরতা মূলত লেখক-পাঠকের সাহিত্যিক সামর্থ্যের (literary competence) ওপর নির্ভরশীল (দ্র. কুলার, ১৩১:২০০২)। বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী রসপ্রাণ পাঠকের কাছে পাঠকৃতি-বিস্তৃত বিভিন্ন ভাষিক চিহ্ন সাধারণ ভাব-গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুস্বর (polyphony)[১] আশ্রয়ী ও বিচিত্র ব্যাখ্যা-প্রদায়ী চিহ্ন-বাহন (sign-vehicle)-রূপে ব্যবহৃত হয়; যা নির্দেশ করে প্রচল পরিপার্শ্ব-উৎসারিত অর্থ অনুধাবনের বিচিত্র পথ। অর্থাৎ, সাহিত্য অনুধাবনে এবং সাহিত্যিকের মনোনির্দেশনা নিরূপনে পাঠকের সহায়ক আয়ুধরূপে চিহ্নবিজ্ঞানকে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুত, চিহ্নবিজ্ঞান সাহিত্যের ভাষিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আকরণ বিশ্লেষণে নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহার করে বলে এর মধ্যে জন্ম নেয় বিশিষ্ট অধিভাষার[২] (metalanguage) আবহ। এ প্রসঙ্গে কুলারের সংজ্ঞার্থটি গ্রহণীয়:

---

[১] 'Literally, [it means] many-voiced. The term is associated with the theories of Mikhail Bakhtin, especially with his idea of the *polyphonic novel*. ... Bakhtin uses the word *voice* in a special way, to include not just matters linguistic but also matters relating to IDEOLOGY and power in society. (Hawthorn; 266-267: 2000)

[২] 'Technically, any language used to describe or refer to another language: 'a language about a language'. One of the characteristics of human word language is that it can function as its own metalanguage. (Hawthorn; 208: 2000)

Dhaka University Institutional Repository

> 'Semiotics is a metalinguistic enterprise. It attempts to describe the evasive, ambiguous, paradoxical language of literature in a sober, unambiguous metalanguage.' (Culler, ix :2001)

অর্থাৎ, চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব ভাষিককৌশল তথা অধিভাষিকতা-বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে নির্দেশ করে আলঙ্কারিক ভাষার লক্ষণা অন্তর্গত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকসহ বিভিন্ন শিল্প-উপকরণের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া। এ কারণে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণে চিহ্নবৈজ্ঞানিক প্রণালী বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এর ভাষাগত শৈলী বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে শৈলীবিজ্ঞান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। শৈলীবিজ্ঞান 'মূলত সাহিত্যের ভাষাভিত্তিক অনুশীলন, এবং তার ভিতর দিয়ে সাহিত্যের রীতি, প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে' (প্রণয়কুমার কুণ্ডু; ৩৭:১৯৯২)। উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের এই ভাষিক শৈলী অনুধাবনে শৈলীবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকসমূহের ভূমিকা বিচারও প্রাসঙ্গিক :

> Stylistics would deal with performance, not competence, and would be a study of texts, not the potential of the language. (Turner; 19:1973)

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সাহিত্যের দ্বৈতীয়িক সজ্জার চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যেখানে 'literary competence' মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সেখানে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাধান্য পায় 'performance' এর দিকটি। উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় 'competence' এবং 'performance' উভয়ের উপস্থিতি তাৎপর্যবহ বলে এদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের প্রত্যয়সমূহ যৌথভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। তাছাড়া, সাহিত্যিক-শৈলীবিজ্ঞানের (literary stylistics) মৌল আলোচ্য বিষয় যেহেতু আলঙ্কারিক ভাষাকাঠামো সেহেতু এই তত্ত্বের আলোকে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক বিশ্লেষণে নতুনতর শিল্প-সম্ভাবনা জাগ্রত করা সম্ভব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

> Stylistics claims — must claim— that the understanding of a work of literary art is continuous with the understanding of its language, and that the close, even technical, study of language is the only sure way to literary understanding. (Hough; 65:1969)

লক্ষণীয়, অধিভাষিক প্রবণতার মানদণ্ডে চিহ্নবিজ্ঞান এবং শৈলীবিজ্ঞান পরস্পর-সম্পর্কিত। কেননা, উপন্যসসহ সাহিত্যের সকল শাখার নান্দনিক বিশ্লেষণে উভয় পদ্ধতি একক বা সম্মিলিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক উপন্যাসের রচনা-রীতির অন্যতম অংশ হওয়ায় এদের বিশ্লেষণে শৈলীবিজ্ঞানের সামগ্রিক তাত্ত্বিকতা সক্রিয় থাকে না; বরং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত প্রণালীতত্ত্বের ব্যবহারযোগ্য উপাদান— যেমন: বাক্যনির্মিতি (sentence-structure), শব্দনির্মিতি (verbal-structure), বিচ্যুতি (deviation), প্রমুখন (foregrounding) প্রভৃতির ভিত্তিতে আলোচ্য শিল্প-উপকরণত্রয়কে ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

করা সম্ভব। এখানে, শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগযোগ্য প্রণালীতত্ত্বের আলোকে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের বিশ্লেষণ কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শৈলীবিজ্ঞানের মূলনীতি অনুসারে, ঔপন্যাসিক গদ্যের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকসমূহের বাক্যিক ও রূপতাত্ত্বিক সংগঠনসমূহকে বিবিধ স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়। যুগপৎভাবে, শৈলীবিজ্ঞান বিবেচনা করে আলোচ্য শিল্প-উপকরণজাত বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গির তাৎপর্য ও স্বাতন্ত্র্য। এরই সূত্র ধরে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রমুখন এবং বিচ্যুতি। আলোচ্য বিশ্লেষণক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, প্রমুখন হল এই ত্রয়ী শিল্প-উপকরণের আশ্রয়ে প্রতিবেশ সাপেক্ষে বিগঠিত বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি; যা উপন্যাসের স্থানিক বা সামগ্রিক ভাব-প্রবণতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি-উন্মুখ হয়ে পাঠকৃতির সম্মুখবর্তী হয় এবং পাঠকের নিকট নিজের অনন্যতন্ত্র আকর্ষণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> In poetic language foregrounding achieves maximum intensity to the extent of pushing communication into the background as the objective of expression and of being used for its own sake; it is not used in the services of communication, but in order to place in the foreground the act of expression, the act of speech itself. (Mukarovsky; 17-30:1964)

অপরদিকে, বিচ্যুতি হল সাহিত্যের কোনো প্রচল রীতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময় অবস্থানের অভিমুখী হওয়া। শৈলীবিজ্ঞানীগণ এই প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন বিচ্যুতিবাদ (deviationism) তত্ত্বের সাহায্যে। এই তত্ত্ব অনুসারে, 'স্টাইল হল 'আলাদা' হওয়া— একটি norm বা আদর্শ থেকে সরে আসা। সাধারণ থেকে বিশেষে পৌঁছানো: যা সকলের, তা থেকে ব্যক্তিগত কোনো অংশে উত্তীর্ণ হওয়া' (পবিত্র সরকার; ৬৪-৬৫:১৯৯২)। উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাতিস্বিকতা কিংবা ব্যবহারের অ-পূর্বত্ব শিল্পীর বিচ্যুতিসামর্থ্যরূপে শৈলীবিজ্ঞানে নির্দেশিত হয়। বস্তুত, এই বিচ্যুতি প্রবণতাই শিল্পীর নিজস্ব শৈলী সৃজনে সাহায্য করে, তাকে 'দশের মধ্যে এগারো' করে তোলে। তবে, এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রণোদনা সর্বদা ব্যক্তিক (individual) স্তরে বিকশিত নাও হতে পারে; কখনো-কখনো একদল সমসাময়িক শিল্পী কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় উত্তরাধিকার অর্জনে আকাঙ্ক্ষী শিল্পীবর্গ সামষ্টিকভাবে অভিন্ন শৈলীর প্রয়োগে উৎসাহী হতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রেও সমষ্টিগতভাবে তাঁরা এক বিশিষ্ট বিচ্যুতির প্রবণতাকে ধারণ করতে সচেষ্ট হন। বলা যায় যে, শৈলীবিজ্ঞান চূড়ান্তভাবে সাহিত্যিকের অনন্যতাকেই প্রতিষ্ঠা করে; তাই শৈলী যেন 'লেখকের আঙুলের ছাপের মতোই— অভিনব, অনন্য ও সদৃশরহিত' (পবিত্র সরকার; ৬২:১৯৯২)। বিশেষত উপন্যাসের পাঠকৃতিতে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জৈবযোজনায় এই অ-পূর্বত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সকল চিহ্নের অনাস্বাদিতপূর্ব চিহ্নায়ন ঔপন্যাসিকের নিজস্ব শৈলী গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপন্যাসের পাঠকৃতিতে এ-সকল শৈলী-আশ্রয়ী শিল্প-উপকরণের ব্যবহার প্রধানত রচয়িতার সচেতন মানস প্রবণতার ফল। এ-কারণে শৈলীবিজ্ঞানেও ঔপন্যাসিকের এই প্রবণতা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিকের এ প্রবণতা তথা প্রেরণার উৎসগুলোকে পবিত্র সরকার (১৯৯২) শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

১. লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ঝোঁক, অভিমুখিতা এবং অসংজ্ঞ ভাষা-স্বভাব;
২. যে বিষয় নিয়ে লিখছেন তার কিছু রীতিগত তাগিদ;
৩. যে পাঠককে লক্ষ্য করে লিখছেন তার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক;
৪. লেখার উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকে, তার প্রেরণা;
৫. লেখার সংরূপ (genre)-এর নিজস্ব রীতিগত দাবী।

উপর্যুক্ত শিল্পসৃজন-উৎসসমূহ সার্বিকভাবে উপন্যাসের শৈলী বিগঠনে যেমন কার্যকর, তেমনি উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়নের প্রকৃতি অনুধাবনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নসমূহের আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক মূলত বিবিধ বিশেষণের মালা সাজান; সমগ্র রচনায় প্রোথিত করেন নিজস্ব শৈলীর স্পষ্ট নির্দেশনা। এ সকল চিহ্ন যেহেতু কোনো ভাবসংজ্ঞাপন, বস্তু-পরিপ্রেক্ষিত সৃজন, চরিত্র বা চরিত্রপুঞ্জের বিকাশসাধনসহ বিবিধ নান্দনিক অবভাসের ব্যাখ্যা, নির্দেশনা ও দ্যোতনায় প্রযুক্ত হয়, সেহেতু এদেরকে সম্প্রসারিত বিশেষণরূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। অটো ইয়েসপার্সন এ-সকল সম্প্রসারিত বিশেষণের ভূমিকাকে (function) দ্বি-স্তরে বিভাজিত করে দেখিয়েছেন। এর একটি হল সুনির্দিষ্ট ভূমিকা (restrictive function), এবং অপরটি হল অনির্দেশ্য ভূমিকা (non-restrictive function)। অর্থাৎ, এ-সকল বিশেষণ কেবল বিশেষ্যকে সুনির্দিষ্ট করছে না একইসঙ্গে বিশেষ্যের নানামাত্রিক বিবর্ধনেও সহায়তা করছে। তাঁর মতে, এগুলো হল epitheta orantia বা আলঙ্কারিক বিশেষণ (দ্র. ইয়েসপার্সন; ১০৮-১২:১৯৬৮)। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, রূপান্তরমূলক ও সৃজনশীল ব্যাকরণের তত্ত্ব অনুসারে সকল বিশেষণের উৎস বাক্যের কর্তা-সম্বন্ধিত নানাবিধ সংজ্ঞাপন। আর তাই বাক্যের উপরিতলে (surface structure) তা কর্তার সম্মুখবর্তী হলেও রূপান্তরের মাধ্যমে গভীর তলে (deep structure) বিশেষণটির অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে। বিষয়টি শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, গভীর তলে এর রীতিগত সমন্বয়মুখিনতা অধিকতর স্পষ্ট। সাহিত্যের পাঠকৃতিতে এভাবেই verbal style থেকে nominal style-এ ক্রমরূপান্তরের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (দ্র. রুলন; ২১৩-২০:১৯৬০)। এ-কারণে রচয়িতার মনোচেতনা যখন কোনো উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের আশ্রয়ে বিশেষ কোনো চিহ্নায়ন প্রত্যাশায় ধাবিত হয় তখন সে সংশ্লিষ্ট বাক্যের বিশেষণাত্মক বিন্যাস গভীর তলাশ্রিত বিশেষ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

ঔপন্যাসিক-গদ্যের ভাষায় উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নসমূহ মূলত আলঙ্কারিক বিশেষণের সঙ্গে একীভূত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এ সকল বিশেষণের আশ্রয়েই রচয়িতার অভিজ্ঞতা ও বর্ণনার বিস্তার ঘটে, অপনীত হয় অস্পষ্টতা ও নির্জীবতা। যুগপৎভাবে, এই বিশেষণসমূহ নান্দনিকতার আবেশে প্রাথমিক জ্ঞাপনক্রিয়ার সীমা পেরিয়ে যায়; বিমূর্ত অভিব্যক্তির জগৎকে স্পর্শ করে। উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের মতো বিশেষণগুচ্ছ এভাবে কেবল ব্যঞ্জনার্থের গভীরতাকেই সম্প্রসারিত করে না, একইসঙ্গে, ধ্বনি, রূপ ও বাক্য-স্তরে নানাবিধ নান্দনিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে বিবিধ মাত্রা ও আয়তনে এর শৈলীকে বিশিষ্ট উচ্চতা প্রদানে সচেষ্ট হয়। ফলে, এ-সকল সম্প্রসারিত বিশেষণ অনিবার্যভাবে বর্ণনীয়কে অন্য কোনো প্রতিতুলনীয় বস্তুর আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। এ-সকল শিল্প-উকরণের মুখ্য শক্তিই হল তুলনা-

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিতুলনা। উপমায় যেমন 'মতো', 'সম', 'সদৃশ' কখনো-বা 'যেন' প্রভৃতি তুলনাবাচক সংযোজক অব্যয়ের প্রয়োগ সুলভ; তেমনি চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকে বাধ্যতামূলকভাবে এ-সকল অব্যয়পদ উপস্থিত না থাকলেও উপমান-উপমেয়ের অন্তর্লীন সহযোজনায় একটি প্রচ্ছন্ন তুলনামূলকতা নির্বিকল্পভাবেই অনুধাবনযোগ্য। একইসঙ্গে, তা প্রমুখন কৌশলের আশ্রয়ে বিষয়কে বিষয়ের বাইরে বিস্তৃত করে তোলে। রূপ ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণে বলা যায় যে, উপমা-চিত্রকল্প প্রায়শই খণ্ড বাক্য, পূর্ণ বাক্য কখনো-বা একাধিক বাক্যে বিন্যস্ত হয়ে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। অপরদিকে, প্রতীক মূলত একটি শব্দ নির্ভর, কখনো-বা সমাসবদ্ধ পদ-শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রতীক, আলঙ্কারিক ভাষার উপরিতলে সীমিত পরিসরে ব্যক্ত হলেও গভীরতলে এক বা একাধিক পূর্ণ বাক্যের বিমূর্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। বস্তুত, আভাসিত পূর্ণ বাক্যের অনুভববেদ্য দ্যোতনা প্রতীকের চিহ্নায়নের নান্দনিকতাকে বহুমাত্রায় সমৃদ্ধ করে। তবে, শৈলীগত বিচারে পূর্ণবাক্যের অলঙ্কারের সংগঠন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রমুখনের সম্ভাবনা এবং সামর্থ্যকে কার্যকর করে তুলতে জটিল (complex) সংগঠনবিশিষ্ট পূর্ণ বাক্য ব্যাপক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হতে পারে। কেননা, উপরিতলে যে বাক্যিক সংগঠনটি একান্ত জটিল বলে মনে হয়, গভীর তলে সেই সংগঠনটিই অনেকগুলো সরল বাক্যপুঞ্জের সমাহার বলে বিবেচিত। অর্থাৎ, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক অসীম চিহ্নায়ন সামর্থ্যে উপন্যাসের পাঠকৃতির স্তরবহুল শৈলীকে করে তোলে নান্দনিক, সূচনা করে এক চলমান শিল্পক্রিয়া।

উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নসমূহের চিহ্নায়নে এর সংগঠনের দিকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের ভাষা যেহেতু নিরূপিত ও সচেতন নির্মাণ, সেহেতু রচয়িতার সচেতন ও স্বতস্ফূর্ত প্রতিভান শক্তির সমন্বয়ে ভাষার বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র বিন্যাসে এ-সকল শিল্প-উপকরণ নির্বাচিত ও সৃজিত হয়। লেখক অনেকগুলো বিকল্প আলঙ্কারিক বিশেষণের দল থেকে যে নির্দিষ্ট উপকরণটি গ্রহণ করেন তার প্রয়োগ প্রতিবেশ সাপেক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই স্পর্শ করে শৈল্পিক উত্তরণের সর্বোচ্চ বিন্দু। প্রতিবেশজাত এই সাপেক্ষতাকে প্রধানত দুটি মাত্রায় বিভক্ত করা চলে— এর একটি হল উপযুক্ত ধ্বনি-প্রতিবেশ এবং অপরটি হল যথার্থ বাগর্থ-প্রতিবেশ। এ-দুয়ের সমন্বয়ে সংগঠনগত ও বিন্যাসের নানাবিধ পৌনঃপুনিকতার সূত্র ধরে উপন্যাসের সমগ্র পাঠকৃতিতে নির্বাচিত আলঙ্কারিক বিশেষণের বিস্তৃতি ঘটে।

আদিকাল থেকেই সাহিত্যে উপমা, চিত্রকল্প এবং প্রতীকের ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত। বিশ্বের যে কোনো সাহিত্য কাব্যশাসিত প্রারম্ভ-স্তর পেরিয়ে যখন গদ্যের অসীম শক্তিকে আবিষ্কার করেছে, তখনো তাতে অনিবার্যভাবে এ-সকল শিল্প-উপকরণ স্থান পেয়েছে। তবে, আঠারো শতক থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহে বহুলাঙ্গ সংবেদনায় আবির্ভূত হয়েছে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের মতো সাহিত্য-কৌশল। বিশেষত, উনিশ শতকের বিশ্ব-উপন্যাসসাহিত্য যে মৌল পরিবর্তনমুখিনতার মধ্যে ক্রমআন্দোলিত হতে শুরু করে, তাতে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রায়শই হয়ে উঠেছে মানবাত্মার জটিল মনোসমীকরণের অনিবার্য অংশ। বলা যেতে পারে, 'সমাজ এবং সভ্যতার অন্তরের অসঙ্গতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে যত স্পষ্ট হয়েছে, যত তার খণ্ডীভবনকে তাঁরা অনুভব করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

তত ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রঙ্কনে অন্তর্মুখিতার আশ্রয় নিয়েছেন' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১:১৯৮৮)। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের শক্তি ও সম্ভাবনার অনন্ততা উপন্যাসের শিল্পসামর্থ্যকেই কেবল নান্দনিক উচ্চতা প্রদান করেনি, সেইসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশে শিল্পীর অন্তরাল-যাপনের উপায়রূপেও সক্রিয় থেকেছে। ফলে, জেন অস্টেন, চার্লস ডিকেন্স কিংবা জর্জ ইলিয়ট যেমন এই শব্দশিল্পকে আশ্রয় করেই আত্মসন্ধিৎসায় ব্রতী হয়েছিলেন, তেমনি 'উনিশ শতকের উপন্যাসের আদর্শ পুরুষ' বাল্‌জাক, স্তাঁদাল এবং লিও টলস্টয়ও বিরূপ সমাজ-পঙ্কের আবিলতায় শব্দের আড়ালকে আশ্রয় করেই মনোময় কল্পবিশ্বের মুক্তি খুঁজেছিলেন। ফলে, উনিশ শতকীয় উপন্যাসবিশ্ব একান্তভাবেই শব্দার্থের নিগূঢ় ব্যঞ্জনাশক্তিকে বিচিত্র আঙ্গিক-উপকরণে আত্মস্থ করতে চেয়েছে। সেইসঙ্গে, গুস্তাফ ফ্লবেয়ার, দস্তয়ভস্কি কিংবা হেনরি জেমসের আধুনিক আঙ্গিক সচেতনতার ভিত্তিভূমিকেও স্বীকার করবার সামর্থ্য অর্জন করেছে। পাশ্চাত্য উপন্যাসের এ বহুমুখ পালাবদলের ছায়াতলে উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনা ও ক্রমবিকাশমানতার প্রেক্ষাপটও নির্বিকল্পভাবে শব্দসৌকর্যের নিকট আত্মসমর্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস-প্রচেষ্টার সূত্র ধরে বাংলা উপন্যাসের পর্যায়ক্রমিক বিকাশসাধন-প্রক্রিয়াকে অনন্যতা দান করেছে শব্দময় শিল্পপ্রকরণকৌশল। জীবনের ব্যাপ্ত-বিস্তারকে গহীনবোধস্পর্শী বাণীসম্ভারে সংহত করে তুলতে তাঁরা উভয়েই উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রয়োগে হয়ে ওঠেন আগ্রহী।

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের মৌল বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন এবং বিচিত্র হলেও সাহিত্যে তথা উপন্যাসে এদের প্রয়োগ প্রায়শই পরস্পরিত। উপর্যুক্ত আলোচনায় এই শিল্প-উপকরণত্রয় স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেও এদের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয়। লেখকের সমাজপরিস্থিতি উদ্ভূত বস্তুবোধকে উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক-ই অনন্তসঞ্চারী শিল্পবোধে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এদের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা একান্তভাবেই পরস্পর সন্নিবেশিত এবং আন্তঃসম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতির অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসসমূহে উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীকের চিহ্নায়ন ও শৈলীগত অবস্থানের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিম-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিম-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক গদ্য কাব্যিক গীতলতায় শিল্পরূপায়িত। অচরিতার্থ কবিত্বশক্তিকে[১] আমৃত্যু তিনি অন্বেষণ করেছেন গদ্যের সৌকর্যে, উপন্যাসের ভাষাকাঠামোর বিচিত্র বিন্যাসে। তাঁর যে-কোনো প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসেই কবিতার নির্মোক-জড়ানো উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের সমারোহ লক্ষ করা যায়। বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সর্বতোমুখী রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে নবীন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল, সেই শিল্প-সামর্থ্যকে ঔপন্যাসিক-কাঠামো দান করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে লক্ষণীয়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) আবির্ভাবে উনিশ শতকের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে যেমন গুণগত বিবর্তন সঞ্চালিত হয়েছিল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় বাংলা উপন্যাসে অর্জিত হয় মানব হৃদয়ের সকল প্রকার হার্দ্য অনুষঙ্গকে দেশকালের পটে ধারণ ও এদের চিরায়ত রূপায়ণের সামর্থ্য। ভাবমুক্তির প্রত্যাশায় মধুসূদন বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দের প্রচল কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে এর আলঙ্কারিক ভাষাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভব-দ্যোতনায় যেমন বহুমাত্রিক করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি আপন সৃজনদক্ষতায় বাংলা সাহিত্যিক-গদ্যের অন্তর্গত শক্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্প-প্রকাশের উপযুক্ত করে তোলেন। একইসঙ্গে, উনিশ শতকের নতুন কাব্যভাষায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) লিরিকধর্মী রোমান্টিকতা ও সংবেদনশীলতাও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ঔপন্যাসিক আবেশে অনায়াসে আত্মস্থ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, বাংলা কবিতায় *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১) এবং *সঙ্গীতশতক* (১৮৬২) নবীন রেঁনেসাসিয় বোধ ও শিল্পাঙ্গিককে যে নতুনতর দৃষ্টিকোণে আয়ত্ত করতে চেয়েছে, ঈষদুত্তর কালে রচিত *দুর্গেশনন্দিনীর* (১৮৬৫) মাধ্যমে সে শিল্পপ্রত্যাশা ভিন্ন স্বরে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। সুতরাং, বাংলা কবিতার পালাবদলে মধুসূদন ও বিহারীলালের ভূমিকা যেমন অনন্য, তেমনি বাংলা উপন্যাসের পথ সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থানও একক ও অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ধারণ করেন আখ্যান নির্মিতির এক সমন্বয়ধর্মী সূক্ষ্মতা; সময় ও সমাজের নান্দনিক সহযোজনায় অন্বিষ্ট পাঠকৃতিতে তিনি প্রয়োগ করেন স্বোপার্জিত মূল্যবোধের বিতর্ক-সম্ভব বিন্যাস। ইতিহাসে উৎকীর্ণ রাজপুরুষের মনোব্যাপ্ত সংঘাত কিংবা উচ্চশ্রেণীর বাঙালি পরিবার ও এর পুরুষতান্ত্রিক সামন্ত-বিন্যাসের প্রতি সমমর্মী আকর্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রকে রোমান্সের

---

[১] '... কালিদাস ও মাইকেলের রচনার অস্থিমজ্জায় ও সর্বাঙ্গ জুড়ে উপমা। ... কবি বঙ্কিম সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। যদিও প্রচলিত অর্থে তিনি কবি নন। ... তাঁর কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর উপন্যাসগুলিতেই; তরুণ বয়সের ললিতা ও মানসকাব্যে নয়।' (অজয়কুমার ঘোষ; ১৫২:১৯৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো গ্রহণে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত, প্রতীচ্য প্রভাবিত রেনেসাঁসিয় বোধে উজ্জীবিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারী-পুরুষকে স্বসমাজে অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়েই মূলত কল্পনা ও বাস্তবের পরস্পর-প্লাবিতা, ইতিহাস আর আকস্মিকতায় প্রচ্ছাদিত রোমান্সের আলো-আঁধারির যুগলধর্মে উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে একদিকে যেমন সমাজের অন্ত্যবাসী সাধারণ মানুষ প্রায়-অনুপস্থিত; অপরদিকে, পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত রেনেসাঁসিয় নারীচেতনাও প্রায়শ নিজের মতাদর্শ বিশ্বাস আর উদ্দেশ্যের দোলাচলে অস্পষ্ট। বিকাশমান মধ্যশ্রেণী এবং বুর্জোয়া সমাজকাঠামোর অন্তর্গত জীবনকে বাস্তবে আলিঙ্গন করেও তিনি কখনোই প্রকৃত নাগরিক পরিবেশকে উপন্যাসে ধারণ করতে সচেষ্ট হননি[১]। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধীরে ধীরে জটিল হয়ে-ওঠা উপনিবেশ-জীবনধারার নন্দন-সূক্ষ্ম বর্ণনা ও বিশ্লেষণ তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসসমূহের বীজ-শক্তিতে সমন্বিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোগঠনে কালিক উপযোগিতাবাদ কিংবা আদর্শায়িত নীতিমূলকতা অমোচনীয় প্রভাব বিস্তার করলেও যে নান্দনিক-স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর ঔপন্যাসিক-সত্তায় আমৃত্যু লালিত হয়েছে, তাতে অনিবার্যভাবেই ঋজু স্থান অর্জন করেছে সুগভীর শিল্পপ্রত্যয়, বহুস্বরের প্রেরণা। রোমান্সের কুহেলিকাকে আশ্রয় করেও এক অনিবার্য রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণায় তাঁর শিল্পিসত্তা গভীরভাবে উদ্দীপিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

> এই যে সৃষ্টিশীল কল্পনা, ইহার মূলে আছে সমগ্র-দৃষ্টি, তাই— ইংরেজীতে যাহাকে analytical বলে সে প্রবৃত্তি ইহাতে নাই; চরিত্র, প্লট— সকলই একটি কেন্দ্রগত রহস্যে, এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া সেই কল্পনায় ধরা দেয় যে, কবিকে যেন কোন চিন্তাই করিতে হয় না, যতকিছু কার্য্য-কারণ-জিজ্ঞাসা, যতকিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সেই সৃষ্টিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত (implicit) হইয়াই আছে। এইজন্য এরূপ কাব্যের নির্ম্মাণ-কৌশল প্রাকৃতিক নির্ম্মাণ-কৌশলের মতই সমালোচকের বিস্ময় উৎপাদন করে।... সর্ব্বোপরি উপন্যাসের সকল অংশ ও উপকরণ এমনই একটা মূলসূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত যে, তাহাদের কোনটাকে অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। (মোহিতলাল মজুমদার; ৪৬:১৯৯৪)

এই অখণ্ড রহস্যাবৃত শিল্পবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পূর্বাপর ব্যাপ্ত। সেইসঙ্গে, তাঁর প্রাক্‌চেতনা (preconsciousness) ও আকল্পিত (hypothetic) পরিণতিবোধ যখন আধিপত্যবাদী ও আরোপমুখী ধর্ম সংগুপ্ত করে পাঠকের সামনে পাঠকৃতি ব্যাখ্যানের নিরন্ত দৃষ্টিকোণকে সমন্বিত করে তখনই তাতে সংপ্রোথিত হয় বহুস্বরিক (polophonic) ভঙ্গি, যা লেখকসত্তা ও বহুপাঠকের আপন আপন সত্তার সঙ্গে এক বিমূর্ত শিল্পকথনের মধ্য দিয়ে পাঠকৃতিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলে। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশক এই বৈশিষ্ট্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবার ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'উপন্যাসের ভাষা অলংকৃত, তীব্র বিশ্লেষণ সচকিত উচ্চগ্রামের কল্পনার জন্য সদাপ্রস্তুত' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১০১:১৯৮৮)। বিশেষত, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জৈব-সহযোজনায় সৃজিত এই ভাষিক তাৎপর্য স্রষ্টার জীবন-উপলব্ধির অনেকান্তিক ও অ-পূর্ব চিহ্নায়কের সমন্বয়সূত্রে বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তাঁর উপন্যাস হয়েছে কালোত্তীর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উপন্যাসের

---

[১] *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত নাগরিক জীবনের কথা স্মরণে রেখেও এরূপ মন্তব্য অযথার্থ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তঃশ্রুত কাব্যধারা'[১] রূপে নির্দেশিত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের শৈল্পিক বিন্যাস মূলত আখ্যানের অন্তর্বয়নকে প্রদান করে বহুমাত্রিকতা। সামন্ত-আদর্শায়নের প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা কিংবা নারীর প্রতি অতিমানবীয় দেবীপ্রতিম দৃষ্টিভঙ্গি—— এই সকল প্রবণতার অন্তর্স্রোতবাহী অনিন্দ্য উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয়েই বঙ্কিম-উপন্যাসের কালান্তরের পাঠক শিল্পমুক্তির আস্বাদ লাভ করে। 'উনিশ শতকের বাংলায় রক্ষণশীলতা ও প্রগতি-আভিমুখ্যের দ্বন্দ্বে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক, আকরণ ও ভাষাচেতনা একজন বাক্‌স্থপতির প্রতীক্ষায় ছিল: বঙ্কিমচন্দ্র যুগের নিভৃত ও উৎকণ্ঠিত দাবিকে মেটানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে পরবর্তী লেখক-প্রজন্মের জন্যেও রেখে গেলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত' (তপোধীর ভট্টাচার্য; ১৯৯৯: ১১)। বঙ্কিম-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক বিশ্লেষণে এ মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনাযোগ্য। বস্তুত, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের পাঠকৃতিতে উপর্যুক্ত শিল্প-উপকরণত্রয়ের আশ্রয়ে যে অনেকান্তিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া বিধৃত, তাকে শনাক্ত করে এর শৈলীগত অনুধাবনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে নবীন মাত্রায় আলোকিত করা সম্ভব। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহের রচনাকাল অনুসারে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নির্বাচিত তালিকা প্রণয়ন করা আবশ্যক। প্রথম পর্যায়ে, নির্বাচিত উপমা-চিত্রকল্পের আলোচনায় উপমা ও চিত্রকল্পের পৃথক পৃথক উপ-তালিকা নির্দেশ করে চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের সহায়তায় এদের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য নিরূপণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, সাহিত্যে উপমা ও চিত্রকল্প নিবিড়-সন্নিবিষ্ট বলে অনেকক্ষেত্রেই উপমা সহযোগে চিত্রকল্প গঠনের সুযোগ থেকে যায়। এ-সকল যুগ্মতার দৃষ্টান্ত চিত্রকল্পের উপ-তালিকায় স্থান পাবে। উপমা-চিত্রকল্পের আলোচনার অন্তে প্রতিনিধিত্বশীল প্রতীকসমূহ বিশ্লেষিত হবে।

---

[১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাব্যিক প্রবণতাকে প্রথম শনাক্ত করেন মোহিতলাল মজুমদার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
উপমা-চিত্রকল্প

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে উপমার বিস্তৃতি যত ব্যাপক, শিল্পোত্তীর্ণ চিত্রকল্পের সংখ্যার প্রাচুর্য তত নয়। বলা যেতে পারে, প্রায় উপন্যাসেই তাঁর প্রমুখনলব্ধ বাক্‌ভঙ্গি চিত্রল কাব্যিকতা সংসক্ত হলেও সবসময় তা সফল উপমা কিংবা চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ হয় না। তাঁর স্বোপার্জিত অধিভাষা যখন রসসংবাদী সত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে এক ইন্দ্রিয়াতীত শিল্পব্যঞ্জনায় সমীকৃত হয় তখনই জন্ম নেয় নিখুঁত স্থাপত্যধর্মী উপমা ও চিত্রকল্প। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই নান্দনিক দক্ষতা ধারাবাহিক হলেও নিরবচ্ছিন্ন নয়। এ কারণে অনেকক্ষেত্রেই আলঙ্কারিক বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ সার্থক উপমা বা চিত্রকল্প গঠনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেও পরিণতিতে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ধারাবাহিকভাবে, উপমা ও চিত্রকল্পের পৃথক উপ-তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

উপমা

১. যে মূর্ত্তি সৌন্দর্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পরিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধর দন্ত রোপিত করে, সে এ মূর্ত্তি নহে, যে মূর্ত্তি কোমলতা, মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণকল্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতিমধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি। (প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

২. কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপলব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকর-ফুল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল, অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৩. যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা; (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৪. যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, যেমন নিদাঘশুষ্ক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার বিকশিত হয়; জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রূপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, একবিংশ পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

Dhaka University Institutional Repository

৫. তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্দ্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ এক দিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"(দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৬. এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৭. সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! কেশভার— অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৮. এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৯. সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর— ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায় ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল— উছলিয়া পড়িতেছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

১০. স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।" (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

১১. বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। (প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *মৃণালিনী*)

১২. মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্ব্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *মৃণালিনী*)

১৩. হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলসীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *মৃণালিনী*)

১৪. তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন— অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাড়াঁইল— পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল। (চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *মৃণালিনী*)

১৫. বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন সুধাকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

Dhaka University Institutional Repository

১৬. দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল— নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, আকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১৭. হীরা আবার সুন্দরী— উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১৮. হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। (একবিংশ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১৯. সূর্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?— মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, — বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,... (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

২০. যেমন বালক চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া *একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন*। (দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

২১. কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় দেবেন্দ্রের নিরূপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। (ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

২২. যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। (ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

২৩. বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। (সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

২৪. অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। (একাদশ পরিচ্ছেদ, *ইন্দিরা*)

২৫. আমাকে দেখিয়া সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি, যেন সকালের পদ্মের মত, যেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত, আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল— সর্ব্বাঙ্গ, যেন সকালবেলার সর্বত্র পুষ্পিত শেফালিকার মত, যেন চন্দ্রোদয়ে নদীস্রোতের মত, আনন্দে প্রফুল্ল হইল। (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, *ইন্দিরা*)

২৬. প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত-পদ্ম-রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। ... প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন— সে মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

২৭. শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল— তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

২৮. যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচরজীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। (তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

Dhaka University Institutional Repository

২৯. সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ,বলিষ্ঠ চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল— বলিল, "কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে!... পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি— আমার ভালবাসার নাম— জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। (ষষ্ঠ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

৩০. রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল— রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *রাধারাণী*)

৩১. ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলেই ঝরঝর করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *রাধারাণী*)

৩২. সর্পের মণি থাকে; আমারও বিদ্যা ছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

৩৩. দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কানন মধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

৩৪. লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনো হইবে না। (পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

৩৫. হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল— এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল। (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৩৬. কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। (প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৩৭. গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। (প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৩৮. স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৩৯. নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল— প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ুরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। (প্রথম খণ্ড, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৪০. নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

৪১. দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

৪২. ... তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়— পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়— একটু স্নিগ্ধ হয়। (সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. আমি বাল্যকালে বাঘ পুষিয়াছিলাম, বাঘকে বশ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। বাদশাহকে বশ করিতে পারিলে আমার সেই আনন্দ হইবে। (সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

৪৪. বিবরে নিরুদ্ধ সিংহ সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিলে যেরূপ গর্জ্জন করে, ঔরঙ্গজেব সেইরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (অষ্টম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

৪৫. দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভূঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? (প্রথম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, *আনন্দমঠ*)

৪৬. সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভসিত করিল।... এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। (দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, *আনন্দমঠ*)

৪৭. ভবানন্দ তখন উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ তাহা জানিনা, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারিভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির,ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরন্মেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভা সঞ্চারিত হইতেছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *আনন্দমঠ*)

৪৮. ধসা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। (প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

৪৯. তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ! (তৃতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

৫০. একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম— বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। (তৃতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

চিত্রকল্প

১. আমি আশা-লতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব? (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

২. আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া, শীতল-পবন পথে কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিক কোমল নীলবর্ণ গগণমণ্ডলমধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদু পবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষসকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৩. ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম তবে ফুটিয়া সুখ হইত। (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৫. আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থকিতে জল আধোগামী কেন?/ কেন?/ ললাটলিখন। (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৬. কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না— সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। ... জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৭. বহুদিন অবধি পার্ব্বতীর বারি পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত করে, একদিনের সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায়? (তৃতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, *মৃণালিনী*)

৮. মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্ত সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। (প্রথম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

৯. অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল। (ঊণপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১০. আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে— গঙ্গাকুলে শত শত বৃহত্তরণী শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে— কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

১১. প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা— সে আমার কে? কে তাহা জানি না— সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি— সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ— সে আমার মৃত্যু। (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

১২. প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন? (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

১৩. এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম— ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন? (ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

১৪. যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল— যেন গোলাপের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল— এখন মরি না কেন? (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

১৫. রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে— সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই। (প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

১৬. আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। (প্রথম খণ্ড, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

১৭. প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন,— মবারকের মত তার মুখটা হইয়াছে— আর বাদশাহদিগের সেরপেঁচ কলগার মত তার লেজটা হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

Dhaka University Institutional Repository

১৮. যেমন পথে কেউ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। (প্রথম খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, *দেবী চৌধুরাণী*)

১৯. শ্রী, আজ সীতারামের কাছে— অনন্তের অংশ। (প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

২০. *সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়।* (দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠকৃতিবিন্যস্ত উপমা-চিত্রকল্পসমূহ মূলত লেখকের আকল্প-সঞ্জাত নির্দেশনা ও প্রাণময় সাহিত্য সৃষ্টির চিহ্ন-সমাবেশ। নিজস্ব বৈশেষিক মনোগঠন একদিকে তাঁকে উপযোগিতাবাদের অভিমুখে চালনা করেছে, অপরদিকে অপ্রতিরোধ্য সৃজনশীলতায় তাঁর মনোতলদেশে বিস্তৃত হয়েছে এক রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণা, যা তাঁর হৃদয়ে জাগিয়েছে ভাষিক-স্থাপত্য গড়বার তাগিদ। ফলে, উপন্যাসের আকরণ সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবিশ্বাস এবং নীতিবোধের ক্ষেত্রটি যতখানি নৈর্ব্যক্তিক, তাঁর শিল্পবোধের চারণভূমি ততখানিই বহুমাত্রিক। প্রথম রচিত বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অমিতসম্ভাবী শিল্পপ্রতিভা আভাসিত হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে রচনাটি পূর্বাপর কোনো স্বচ্ছ রসসাফল্যে বিমণ্ডিত নয়। তবে, কালিক বিকাশের ধারাবাহিকতায়, রসপুষ্টি লাভের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় উপমা-চিত্রকল্পসমূহ যেভাবে নান্দনিকতায় জৈবসমন্বিত ও সুদূরসঞ্চারী হয়ে উঠেছে তার সূত্রপাত ঘটেছে *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে।

[ক] দুর্গেশনন্দিনী

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে নিয়তদৃষ্ট সামন্ত-সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে একাধিক নর-নারীর অগভীর মনোজাগতিক অভিব্যক্তির চিহ্নায়ন *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে উপমা-চিত্রকল্পকে প্রধানত মানবীয় কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার কেন্দ্রীয় আয়ুধরূপে প্রয়োগ করলেও অধিকাংশ শিল্পোত্তীর্ণ রচনাতেই এই শিল্প-উপকরণদ্বয়ের প্রয়োগ বহুস্তরিক ও অনেকান্তিক রসোপলব্ধি-সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। কিন্তু, *দুর্গেশনন্দিনী*-তে এ বহুস্বরের ধারাবাহিক অনুরণন সর্বদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এ উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্পসমূহ প্রধানত চরিত্রসমূহের রূপতৃষ্ণার রসময় দ্যোতনা কিংবা একমাত্রিক রোমান্সমুখী আবেগকে শব্দসূত্রে ধারণ করতে আগ্রহী। কখনো-কখনো আকস্মিক শিল্পময়তায় এরা সুগভীর চিহ্নায়ন দ্যোতনাকে আপন বাণী-অবয়বে বহন করে। প্রসঙ্গত, উপমা উপ-তালিকার ১ থেকে ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। প্রথমটিতে, উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তিলোত্তমার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে একগুচ্ছ পরস্পর সমান্তরাল বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র পাঠকৃতিতে, তিলোত্তমার বিন্যাস যতখানি রূপচ্ছটা-বিকাশী ততখানি হার্দ্য-স্তরবহুল নয়। আলোচ্য উপমাচিহ্নেও তিলোত্তমা চরিত্রের এ অপূর্ণতা সহজদৃষ্ট। কিন্তু উপমাটির সার্থকতা তাঁর নির্মাণে; চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের সমানুপাতিক প্রয়োগ ও এদের সমান্তরাল সহাবস্থানে তাই তা হয়ে উঠেছে নান্দনিক। বঙ্কিমচন্দ্র উপমাটির সংগঠনে যে

Dhaka University Institutional Repository

প্যারাডাইমসমূহ ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তা তাঁর সমসময়ের প্রেক্ষাপটে স্বল্পপ্রচল। আবহমান কাল ধরে বাংলা সাহিত্যে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় বৈচিত্র্যহীন, প্রকৃতি-আশ্রয়ী একমাত্রিক উপমান তথা চিহ্নায়কের ব্যবহার ছিল সুপ্রচল। আলোচ্য উপমায় বঙ্কিমচন্দ্র সে ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে এর প্যারাডিগম্যাটিক সম্পর্ক সৃজনে ব্যবহার করেছেন আত্মিক বোধসঞ্চারী প্রকৃতি-উৎসারিত অনুষঙ্গ। একইসঙ্গে, এদের সিনট্যাগম্যাটিক সম্বন্ধ-পরিকল্পনাকে নান্দনিক করে তুলতে নির্বাচিত প্যারাডাইমগুলোকে কখনো ফুল ও সাপের পরস্পর বিপ্রতীপতায়, কখনো দৃশ্যমান প্রকৃতি উৎসারিত সুখময় স্মৃতি অনুভাবনার সঙ্গে সমন্বিত করে এক দূরাগত চিত্রকল্পময় ব্যঞ্জনার সৃজনে আগ্রহী হয়েছেন। ফলে, ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যবোধ এবং একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষাক্ত সরীসৃপের বিপরীত সংস্থাপনে যে নতুনতর নান্দনিক বোধ তিনি সঞ্চার করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে উপমা প্রয়োগের এক স্বতন্ত্র স্মারক। ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে, ত্রিমাত্রিক বিশেষত্বে ফুলের চিহ্নায়ক ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমা-বিমলা-আয়েষার মনোগত বিন্যাস, আখ্যানে তাদের তুলনামূলক অবস্থান এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত রূপসৌন্দর্যের অন্তরালে যে নিগূঢ় যন্ত্রণায় তারা সমাচ্ছন্ন; তাকেই চিহ্নায়িত করবার শিল্পপ্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। বিশেষত, এই তুলনামূলক উপমা-ধারার শেষাংশে আয়েষার রূপাশ্রয়ী মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় রৌদ্রতপ্ত জলপদ্মের যে মলিন অথচ প্রফুল্ল শব্দচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মাধ্যমে আয়েষার অনিঃশেষ বেদনানুভবই আভাসিত। সমগ্র পাঠকৃতিতে আয়েষা চরিত্রের এ অব্যাখ্যাত গভীরতাকে আরোপিতভাবে স্পষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বহুদৃষ্ট চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ববহ। রচয়িতার আকল্প অনুসারে সক্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের মানদণ্ডে বিমলার সঙ্গে প্রতিতুলনায় আয়েষা চরিত্রের তাৎপর্য আলোচ্য উপমার সূত্রে স্পষ্টতর হয়েছে। এক্ষেত্রে ট্রাজেডি নাটকের রীতি অনুসরণ করে মানব মনের অতৃপ্তি ও যন্ত্রণাবোধের শিল্পরূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে, বিমলা এবং আয়েষা চরিত্রদ্বয়ের তাৎপর্যব্যাখ্যানের লক্ষ্যে সহজ অথচ ব্যঞ্জনাময় আকরণে উপমাটির প্রয়োগ ঘটেছে। উপমা সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্রের নান্দনিক দক্ষতার উজ্জ্বল চিহ্নায়নে ৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। এই উপমাটিতে বিধৃত জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রণয়সংবেগকে নিরন্তিত্বের উপান্ত্যসীমা থেকে পুনরায় অস্তিত্বময় করবার নান্দনিক প্রণোদনা আলোচ্য উপন্যাসের শিল্প-প্রতিশ্রুতি পালনকে চিহ্নায়িত করেছে। উপমাটিতে রচয়িতা অন্যাসক্ত অলঙ্কারের সূত্রে চিত্রকল্প সৃজনের যে সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, তা হয়তো প্রচল প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের চিত্রাত্মক প্রয়োগের মধ্যেই সংগুপ্ত থেকে গেছে, কিন্তু চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জার নিবিড়-সম্পর্ক অধিভাষিকতায় তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের মনোসংগঠনকে প্রকাশ করেছে। ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্তর্গত শিল্পবোধের প্রেরণায় পুনরায় ফিরে গেছেন আয়েষার নান্দনিক মনোবিশ্বের কাছে। যে মানবিক সাহসিকতা, প্রেমময় দৃঢ়তা, সর্বোপরি প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমীকৃত অন্তহীন সংক্ষোভকে ঔপন্যাসিক আয়েষা চরিত্রে অন্বেষণ করেছিলেন তারই শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে এই উপমায়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, আয়েষা চরিত্রে আলঙ্কারিক বিশেষণ ব্যবহারে পৌনঃপুনিকভাবে পদ্মফুলের চিহ্নায়কের প্রয়োগ যেন রচয়িতার কোনো প্রতীকী প্রকাশভঙ্গিকে দ্যোতিত করে। আলোচ্য দৃষ্টান্তে এই মন্তব্যেরই সমর্থন লক্ষ করা যায়। বস্তুত, অভিন্ন অনুষঙ্গ পুনর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীকী তাৎপর্যেই আয়েষার দৃঢ়তাপূর্ণ প্রেমাভিব্যক্তিকে উপমিত করতে চেয়েছেন। জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার পরিণতিহীন হৃদয়াবেগ এবং এর বিপরীতে তার প্রতি ওসমানের প্রত্যাখ্যাত-প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে যুগপৎ নান্দনিকতায় তিনি ধারণ করেছেন এই দৃষ্টান্তে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকল্প উপ-তালিকার অন্তর্গত *দুর্গেশনন্দিনীর* চিত্রকল্পদ্বয়ের শৈল্পিক বিন্যাসে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে অভিগমনের প্রক্রিয়া খুব স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ওসমান প্রসঙ্গে উল্লেখিত ১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বঙ্কিমচন্দ্র রূপক অলঙ্কারের আশ্রয়ে আয়েষার প্রতি ওসমানের একপাক্ষিক প্রেমের অনিশ্চিত সংবেদনকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন। অপরদিকে, ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নানাবিধ প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের প্যারাডাইম সজ্জার অন্তস্তলে আয়েষার সম্ভাব্য অমোচনীয় বেদনা ও নীলাভ প্রেম-যন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে। বস্তুপরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা-আশ্রয়ে জগৎসিংহ-আয়েষার অগ্রন্থিবদ্ধ প্রণয়-সম্ভাবনার সিনট্যাগম্যাটিক সম্পর্কের আশ্রয়ে এর শিল্পরূপ পূর্ণতা পেতে চেয়েছে। এই মন্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের উদ্ধৃতিতে:

> যেমন শীতার্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্য কালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১ এবং ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্যে যে নান্দনিক রসাবেদনের সূত্রপাত ঘটেছিল, এই উদ্ধৃতিতে তা অনেকখানি পূর্ণতা লাভ করেছে। একইসঙ্গে, পাঠকের সামনেও উপস্থাপন করেছে সুগভীর ও বহুমাত্রিক ইন্দ্রিয়-উত্তীর্ণ অনুভবের মায়াজাল বিস্তারের সম্ভাবনা। তা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, *দুর্গেশনন্দনী* উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্থক চিত্রকল্প সৃজনের সুযোগ অব্যবহৃত থেকে গেছে। সার্থক শিল্প উপকরণ সৃজনের এই সীমাবদ্ধতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরবর্তী উপন্যাসসমূহে অতিদ্রুত অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

[খ] কপালকুণ্ডলা

সংসার-উৎকেন্দ্রিক নারী, মোহাবিষ্ট পুরুষ আর প্রতিহিংসাপরায়ণ রমণীর বহুস্তর দ্বন্দ্ব ও সক্রিয়তায় *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত। এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপমার জগৎকে পরিপূর্ণ অর্থে নান্দনিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। রোমান্সের জগতে অবস্থান করেও যুগানুবর্তী এক বিশিষ্ট রোমান্টিক সৌন্দর্যপিপাসায় বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে ধারণ করেছেন সুগভীর নিসর্গ-চেতনা, মানবমনের রহস্যাচ্ছাদিত স্বরূপ। এমনকী উপন্যাসের পরিণতি সৃজনেও তিনি ব্যবহার করেছেন রোমান্টিক কবিতা-সদৃশ অনির্বচনীয় সমাপ্তি-কৌশল। সেইসঙ্গে, এই রচনা থেকেই উপমা ব্যবহারের অধিভাষিক কৌশলে পাঠকের সম্মুখে এক ভিন্ন কথনবিশ্ব সৃজন করতে সমর্থ হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশি সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত নন্দনভাবনায় সমৃদ্ধ। উপন্যাসের পাঠকৃতির বিস্তার ও বিন্যাসে তিনি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষের বিবিধ উপাদান। সমাজবিচ্ছিন্ন আরণ্যক নির্জনতায় লালিত অপাপবিদ্ধ নারীর সামাজিক অভিক্ষেপ এবং তাঁর জটিল পরিণতির যে আকল্প তাঁর মানসপটে প্রস্তুত ছিল, রোমান্সের কাঠামো-আশ্রয়ে তার শিল্পরূপায়ণের লক্ষ্যে তিনি আত্মস্থ করেন আলঙ্কারিক ভাষার সুনির্বাচিত সংযোগ। ফলে, তাঁর উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প হয়ে ওঠে অধিভাষিক গুণে সমৃদ্ধ, অর্জন করে আখ্যান কিংবা চরিত্র ব্যাখ্যার

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পসামর্থ্য। *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণেই এ সত্য অনুধাবন সম্ভব। এই উপন্যাসে উপমা কিংবা চিত্রকল্পের গঠন ও বিন্যাস; প্যারাডিগম্যাটিক ও সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জা সৃজনে তিনি আর বহুপ্রচল চিহ্নায়ক-নির্ভর নন। এর পরিবর্তে সাধারণ শব্দাবয়বে গঠিত চিহ্নায়কেরা অসীম চিহ্নতার দ্যোতনা সঞ্চারের সূত্রে পুরো চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকেই বহুস্বরে আন্দোলিত করতে সচেষ্ট। ফলে, উপমার চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত প্রায়শই এক-এক প্রতিসম্পর্কে সম্বন্ধিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের আপাতসম্পর্কের অন্তরালে একাধিক মাত্রাসংবলিত বিচিত্র প্রতিসমতা উপমাসমূহকে রসোত্তীর্ণ করে তোলে। প্রসঙ্গত, উপমা উপতালিকার ৬ থেকে ১০ সংখ্যক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। ৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নিসর্গ বর্ণনার অনুষঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস-রাজনীতির এক বিশেষ কালকে উপমায় ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যদিও উপনিবেশিত ভারতের সমকালিক সমাজপটের কোন গভীরতা সঞ্চারী ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না, তবুও তাঁর মনোগঠন, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি নির্বিকল্পভাবে ঔপনিবেশিক আবহে প্রতিপালিত। ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনাভিযান ইংরাজ উপনিবেশে সূচিত ও সমাপ্ত হলেও বণিকশক্তির যে ধারাবাহিক আগমন ভারতবর্ষকে নানামাত্রায় প্রভাবিত করেছে তাকে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ তাঁর ছিল না। এ কারণেই রোমান্সের পরিবেশেও বঙ্কিমচন্দ্র অতিকায় পাখির বিশাল সাদা ডানার চিহ্নায়ক ব্যবহার করে উপনিবেশ বিস্তারের আপাত ইতিবাচকতাকেই যেন চিহ্নায়িত করতে আগ্রহী। তবে, উপমাটির নান্দনিকতা আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এর প্রারম্ভ অংশে। নীলজল-প্রচ্ছদে অস্তায়মান সূর্যের প্রতিফলিত আলো তরল স্বর্ণের চিত্রকাল্পিক আবেশে সঞ্চার করেছে ব্যতিক্রমী নান্দনিকতা[১]। হয়তো-বা, অস্তায়মান সূর্যের আশ্রয়ে ভারতবর্ষের ক্রমপরাধীনতার একটি ইঙ্গিতও এই উপমায় রূপায়িত; যা আলোচ্য উপন্যাসে না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের শেষপর্বের রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে আরও স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে, বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভাবেই রোমান্স-আবিষ্ট শিল্পীমন নিয়ে নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় আগ্রহী। চিত্রপটে চিত্রের উপমান ব্যবহার করে কপালকুণ্ডলার স্থির সৌন্দর্যকে তিনি রহস্যাবৃত গতিময় প্রকৃতির মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধের কুশলতায় অধিভাষার দ্যুতি ক্রমাগত ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র পাঠকৃতিতে। তাই অতিপ্রচল রোমান্সের আবহের মাঝে অসাধারণ কোনো বিশেষণ ব্যবহার না করেও কেবল অনিন্দ্য-প্রতীম সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জার আশ্রয়ে কপালকুণ্ডলার রহস্যময় রূপরাশিকে নান্দনিকতায় সমন্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের প্রতিসম্পর্ককে প্রধানত দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়— একদিকে কপালকুণ্ডলা, অপরদিকে নবকুমারকে আলোচ্য উপমায় চিহ্নায়িত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু উভয়ের চারিত্রিক বিশেষত্বের তাৎপর্য অনুসন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র অভিন্ন নান্দনিক কৌশল ব্যবহার করেননি। কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে যেখানে মেঘের স্বাধীন বিস্তারকে উপমানরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে নবকুমারের আত্মনিয়ন্ত্রণবিহীন

---

[১] আলোচ্য দৃষ্টান্তটির সমরূপতা লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শিল্পলক্ষ্যের ব্যবধান সত্ত্বেও এই প্যারাডিগম্যাটিক সদৃশতা বাংলা সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতাকেই নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত, কবিতাটির কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> ঝলিতেছে জল তরল অনল,
> গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
> দিক্‌বধূ যেন ছলছল্-আঁখি অশ্রুজলে, ("নিরুদ্দেশ যাত্রা", *সোনার তরী*)

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াশীলতাকে কলের পুত্তলীর পরবশ স্বভাবের অনুরূপতায় প্রতীকায়িত করা হয়েছে। চিহ্নায়ক ব্যবহারের এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত এক ব্যঞ্জনাগভীর নবীন রসানুভূতিকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। ভিন্ন দৃষ্টিকোণে লক্ষণীয়, আলোচ্য দৃষ্টান্তে কপালকুণ্ডলা চরিত্রের উপস্থাপনায় যে সকল বিশেষণ সংযুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ 'শুভ্র মেঘ' এবং 'অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপ'। এই দুটি আলঙ্কারিক বিশেষণের আশ্রয়ে লেখক শিল্পিত করেছেন কপালকুণ্ডলার নিষ্কলুষ ও নিরাসক্ত-ঔদার্যের চারিত্র্যকে। একইসঙ্গে, উপন্যাসের পরিণতিতে কপালকুণ্ডলার প্রতিবাদহীন অভিমানক্ষুব্ধ জীবনমৃত্যুর মধ্যে যে নৈঃশব্দ্যের ছন্দ আবর্তমান, 'অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপ' যেন তারই পূর্বাভাস জ্ঞাপন করে। সামাজিক অভিযোজনে অসমর্থ, নিয়তির তাড়নায় নিরস্তিত্বে অবসিত কপালকুণ্ডলার এই সমীকৃত মনোচেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিচের উদ্ধৃতিতে :

> আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক— কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব। (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ)

কপালকুণ্ডলার এই আপাত মীমাংসা নবকুমারকে আরও বেশি দ্বন্দ্ব জটিলতায় নিক্ষেপ করেছে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায় থেকেই 'পুত্তলী' শব্দবন্ধের প্রতীকতায় যেন নবকুমার চরিত্রের এই অস্থির ও জটিল প্রবণতাসমূহ প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করেছে। বঙ্কিমচেন্দ্রর উপন্যাসে রূপজ-মোহাবিষ্ট পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণহীন গতিপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করবার ক্ষেত্রে এই চিহ্নায়কটি বহুব্যবহৃত। ৯ এবং ১০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে যথাক্রমে মতিবিবির পূর্ণতর দেহ-সৌষ্ঠব এবং অনির্বাণ ক্রোধ ও আত্মবিশ্বাস চিহ্নায়িত। 'ভাদ্র মাসের নদীজল' ও পূর্ণ রূপসৌন্দর্যের অভেদকল্পনার সূত্রে যৌবনের ওপর জলের বৈশিষ্ট্য আরোপের সম্ভাবনার অন্তরালে লেখক যেন মতিবিবির জীবনের আদ্যন্ত অতৃপ্তির কূটাভাসকে সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জায় বিন্যস্ত করতে আগ্রহী। তাই মতিবিবির অমিত প্রত্যাশা :

> এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই। (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

মতিবিবির এই অনিঃশেষ জীবনাকাঙ্ক্ষা, প্রেম প্রত্যাশা আর ঈর্ষার সংশ্লেষে আলোচ্য উপন্যাসে এক অদ্ভুত মনোসংকটের জন্ম দিয়েছে। এ কারণে, 'রাজহংসী' ও 'ফণিনী'— দুই বিপ্রতীপ প্রকৃতির অবপ্রাণীর প্রয়োগ-সূত্রে চিহ্নায়িত হয়ে ওঠে মতিবিবির মনোকেন্দ্র লালিত প্রেম-প্রত্যাখ্যান আর প্রতিজ্ঞা-প্রতিহিংসার বহুস্বর।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের চিত্রকল্প যোজনাও নানামাত্রায় নান্দনিক চেতনাবাহী রসস্পর্শে সমৃদ্ধ। চিত্রকল্প উপ-তালিকার অন্তর্গত ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ফুলের কলির ইমেজে রূপায়িত হয়েছে কপালকুণ্ডলার প্রস্ফুটমান সৌন্দর্য। আপন রূপহীনতা ও কৃষ্ণবর্ণের কারণে ননদ শ্যামাসুন্দীর যে আক্ষেপ, তাকে আলঙ্কারিক ভাষায় উপস্থাপন এবং এর অন্তরালে কপালকুণ্ডলার নিজের সৌন্দর্য বিষয়ে উদাসীনতাকেই বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য চিত্রকল্পে সন্নিবেশিত করেছেন। ৪ ও ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তের প্রথমটিতে মতিবিবির

Dhaka University Institutional Repository

আত্মভাষণ প্রতিফলিত। মোঘল সাম্রাজ্যের জৈবিকতা-সর্বস্ব রাজ-অন্দরমহলে মতিবিবির অবাধ বিচরণের যে অভিজ্ঞতার ইতিহাস ঔপন্যাসিক কখনো চরিত্রের সংলাপে কখনো-বা আপন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, তার মধ্য দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে মতিবিবির উচ্চাভিলাষ বিসর্জিত স্বামীপ্রেম প্রত্যাশী মনোকাঠামো। সম্ভবত উনিশ শতকীয় নীতিমূলকতার প্রভাবে, মতিবিবির সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার কোনো সচেতন দায়ও লেখকসত্তায় সক্রিয় ছিল। এ সকল জটিল বিবেচনাকে স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, 'আগুনে'র রূপকে নির্দেশিত প্রেমহীন প্রবৃত্তিতাড়িত পুরুষের কামানলে মতিবিবির আত্মসমর্পণের কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসে নির্দেশিত হয়নি। যে মানবিক গুণসম্পন্ন প্রেমময় স্বামীর মনোধারণাকে সে বহন করে চলেছে তাকেই নবকুমারের মাঝে অন্বেষণের প্রত্যাশা আলোচ্য দৃষ্টান্তে অভিজ্ঞাপিত হয়েছে। একইভাবে, 'লুৎফউন্নিসা' থেকে 'মতিবিবি' হয়ে ক্রমশ 'পদ্মাবতী'তে পুনর্স্থিত হবার সাধনাকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে নিয়ত অধোগামী জলের রূপকল্প ব্যবহারের মধ্যদিয়ে। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে জলের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই আন্দোলন জাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জলবাহী নদী ক্রমশ নিম্নাভিগমনে সমুদ্রে সমর্পিত হতে চায়। সমুদ্র-উত্থিত বাষ্পীভূত সে জলকণা ক্ষণিকের জন্য আবার সূর্যের কাছাকাছি আকাশের মেঘমালায় প্রত্যাবর্তিত হলেও তাকে কেউ ধারণ করে না। শেষপর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে আসতে হয় সমুদ্রের কাছেই। উপন্যাসের পরিণতিতে যে সমুদ্রে নবকুমারের হারিয়ে যাওয়া, সেই সমুদ্র-গভীর যন্ত্রণার মধ্যেই তাই মতিবিবি শেষপর্যন্ত অবসিত; এরই ইঙ্গিত যেন বহন করছে এই চিত্রকল্প। অভিন্ন উপ-তালিকার ৬ সংখ্যক দৃষ্টান্ত মূলত কপালকুণ্ডলার জীবনাভিযানের বাঁক-মুহূর্তের শিল্প-ইঙ্গিত। জ্বলন্ত আগুনে পতঙ্গের আত্মহননের চিহ্নায়ক-ব্যবহার সুপ্রচল হওয়া সত্ত্বেও এক গভীরতর নির্দেশনায় কপালকুণ্ডলার আত্মঘাতী-পরিণতির আভাসপ্রদায়ী চিত্রকল্পরূপে সামগ্রিক উপন্যাসের চিহ্নায়নেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

[গ] মৃণালিনী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রজনী, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী

মৃণালিনী উপন্যাস *কপালকুণ্ডলার* অব্যবহিত পরবর্তী সৃষ্টি হলেও সাহিত্যিক উচ্চতার মানদণ্ডে তা পূর্ববর্তী উপন্যাসের ধারাবাহী নয়। তবে, উপমা-চিত্রকল্পের নান্দনিক বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসেও সূক্ষ্ম শিল্প-উপকরণের ব্যবহার দুর্লক্ষ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কিছুসংখ্যক উপন্যাস—*ইন্দিরা*, *যুগলাঙ্গুরীয়*, *রাধারাণী*, *রজনী*, *দেবী চৌধুরাণী* প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত মন্তব্য একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। আবার, *রাজসিংহ* উপন্যাসটির গঠনশৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানত উপমা-চিত্রকল্প সৃজন-নির্ভর নয়। এ-সকল উপন্যাস থেকে নির্বাচিত উপমা এবং চিত্রকল্পের উপ-তালিকা পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, প্রায়শই বঙ্কিমচন্দ্র একদেশদর্শী অতিপ্রচল চিহ্নায়কের প্যারাডাইম সজ্জায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত পাঠকৃতিকে বিন্যাস করেছেন। প্রসঙ্গত, উপমার উপ-তালিকার ১১ থেকে ১৪, ২৪ থেকে ২৫, ৩০ থেকে ৩৪ ও ৪১ থেকে ৪৪ সংখ্যক দৃষ্টান্ত এবং চিত্রকল্পের উপ-তালিকার ৭, ১৪,১৭,১৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এ সকল উপমা-চিত্রকল্পের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ নিগূঢ় তাৎপর্যে স্থিত হওয়ার সুযোগ স্বল্প। তবে, এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ১১, ১৪, ৪২, ৪৩ সংখ্যক (উপমা উপ-তালিকা) এবং ১৭ সংখ্যক (চিত্রকল্প উপ-তালিকা)

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত, যা নিঃসন্দেহে বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পসাফল্যের স্মারকরূপে বিবেচিত হতে পারে। *মৃণালিনী* উপন্যাস থেকে সংগৃহীত উপমা উপ-তালিকার ১১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে আখ্যানের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনার সূত্র ধরে গঙ্গা-যমুনার ভগ্নিসদৃশ মিলনের চিহ্নায়ক ব্যবহারের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত এক পৌরাণিক সংহিতাকে উপমার অবয়বে ধারণ করতে চেয়েছেন। পুরাণ-কথায় গঙ্গার আবির্ভাবের অন্তরালে আছে অপ্রতিরোধ্য গতিধারার আত্মসমর্পণের রূপকাভাস, অপরদিকে যমুনার সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুদেব যমের সহোদর-আত্মীয়তার নৈকট্য। এই দুই বৈশিষ্ট্যকে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বিত করেছেন মৃণালিনী ও মনোরমার জীবনকাঠামোর মধ্যে। সমগ্র উপন্যাসে মৃণালিনীর দৃপ্ত বিস্তার এবং মনোরমার মৃত্যুময় পরিণতির দূরাগত ইঙ্গিতকে তিনি উপন্যাসের সূচনাতেই একটি আপাত বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পপ্রতিম আলঙ্কারিক বিশেষণে সন্নিবেশ করেছেন। উপমা উপ-তালিকার ১৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পশুপতি ও মনোরমার মনোদ্বন্দ্বকে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে সর্পদৃষ্ট মানুষের প্রতিবর্তমূলক ক্রিয়াশীলতা। অতি প্রচল উপমান-উৎসের এই স্বতন্ত্র প্রয়োগ বঙ্কিম-উপন্যাসের একটি বৈশেষিক লক্ষণ। *রাজসিংহ* উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত ৪২ ও ৪৩ সংখ্যক উপমা-দৃষ্টান্তে একদিকে চিহ্নায়িত হয়েছে ক্ষমতা-শৃঙ্খলিত বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেবের বিক্ষত হৃদয়ের হাহাকার, অপরদিকে নির্দেশিত হয়েছে সাহসী নির্ম্মলকুমারীর ব্যক্তিত্বময় উচ্চারণ। বস্তুত, নির্ম্মলকুমারীর নির্ভীক উচ্চারণের মধ্যদিয়ে প্রকারান্তরে মোঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রেমময় সত্তা চিহ্নায়িত। বৃদ্ধ সম্রাট ভোগমুখ্য ভালবাসাশূন্য জীবনের প্রান্তে নির্ম্মলকুমারীকে আশ্রয় করে নতুন জীবনাকাঙ্ক্ষাকে লালন করতে চেয়েছেন। সদাসাহসী নির্ম্মলকুমারী সে আহ্বান বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও, তার সহজাত বাক্‌চাতুর্যে সম্রাটের প্রতি তার আগ্রহ ও অনুভবকে ব্যক্ত করেছে। তাই কৌতুকময় উক্তিতে 'বাঘ পোষা'র বাল্যস্মৃতির অনুষঙ্গ ব্যবহার করে মোঘল সম্রাটের উপর নির্ম্মলকুমারীর প্রভাবের চিহ্নায়ন সম্পন্ন করেছেন ঔপন্যাসিক। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে শৈল্পিক স্বতঃস্ফূর্ততায় যেমন ঔরঙ্গজেবকে এক অনন্যসাধারণ প্রেমিকপুরুষরূপে চিহ্নায়িত করেন, তেমনি অপরদিকে নিজস্ব জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস এবং সংকীর্ণ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাবে সেই ঔরঙ্গজেবই তাঁর কাছে নিতান্ত অবপ্রাণীতুল্য হয়ে ওঠে। এমনকী এসব ক্ষেত্রে তাঁর ভাষিক সূক্ষ্মতাও হারিয়ে যায়। নিচের দৃষ্টান্তেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

> মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔপঙ্গজেব বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে লাঙ্গুল নিহিত করিয়া রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন। (অষ্টম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

রজনী উপন্যাসে এক অন্ধ নারীর বেদনা এবং তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কার্যারণ-অস্বচ্ছ রোমান্স কাহিনী শিল্পমানে সার্থক না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রময় শব্দসজ্জা এই রচনায় সুদৃষ্ট। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য:

> দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! (চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

এ ধরণের একাধিক ইন্দ্রিয়ের আবেদন সঞ্চারী উপমা চিহ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিশিষ্ট আবস্থান-চিহ্নিত। কিন্তু এর ক্রমোত্তরণের ধারাটি বিশেষ সুস্পষ্ট নয়। উপমা উপ-তালিকার অন্তর্গত ৩১ সংখ্যক দৃষ্টান্তটি ক্ষুদ্র উপন্যাস *রাধারাণী* হতে সংকলিত। বৃষ্টিধৌত স্ফুটন্ত ফুলকে চিহ্নায়করূপে ব্যবহার করে

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃহীন অসহায় রাধারাণীর প্রেমজ বেদনাকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে এই দৃষ্টান্তে। রুক্মিনীকুমারের সঙ্গে ঘটনাচক্রে লব্ধ সাক্ষাতে তার প্রতি রাধারাণীর প্রণয়াবেগের অভিব্যঞ্জনায় ইন্দ্রিয়বিপর্যাসে রচিত হয়েছে এই শিল্প-উপকরণ। হারিয়ে যাওয়া প্রিয়াস্পদের প্রত্যাবর্তনের এ নান্দনিক চিহ্নায়ন বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে প্রায় অভিন্ন অবয়বে পরিলক্ষিত। *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রফুল্লর সন্তানধর্মে দীক্ষাগ্রহণ আর স্বামী ব্রজেশ্বরকে চাতুরীর আশ্রয়ে ফিরে পাওয়া— এ দুয়ের মাঝে শৈল্পিক সমন্বয়ের অভাব আংশিকভাবে পূরণ করেছে এ রচনার উপমা-চিত্রকল্পের জগৎ। প্রফুল্লর গভীরতাশূন্য আদর্শবোধ, পাতিব্রত্যে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে ব্রজেশ্বরের অপরিণত চরিত্রবিন্যাস এ সকল শিল্প-প্রান্ত বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কখনো বহুব্যাবহৃত সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত, এইসকল উপন্যাসে বিক্ষিপ্তভাবে নান্দনিক উৎকর্ষের যে আলোকসম্পাত সংঘটিত হয়েছে তা বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল্যায়নে প্রদান করেছে ভিন্ন তাৎপর্য।

[ঘ] বিষবৃক্ষ

নর-নারীর রূপতৃষ্ণায় উন্মূলিত দাম্পত্যজীবন এবং ঈর্ষা আর নিয়তির তাড়নায় মানুষের অতলান্তিক বিপর্যয় এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য। বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি-সম্ভারের ব্যতিক্রমী সংযোজন *বিষবৃক্ষ*। এই পর্যায়ে এসে তিনি উপন্যাসের রোমান্স-আচ্ছন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে সামাজিক অভিব্যক্তির মূর্ত ও বিমূর্তরূপের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও *বিষবৃক্ষের* আখ্যান-প্রকরণ কিংবা শিল্প-দর্শনের বিশেষত্ব বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ শৈল্পিক পরিতৃপ্তি দান করেনি। এ কারণেই উত্তরকালে আপাতভাবে প্রায়-অভিন্ন উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন *কৃষ্ণকান্তের উইল*। উভয় উপন্যাসের অন্তর্গূঢ় পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সামাজিক বহুস্বর কেন্দ্রিক সম্পর্ক অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়। অ-সাধারণ আখ্যানপ্রবাহ ও অলোকসামান্য চরিত্রসমষ্টির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে সহজাত আগ্রহ, তা এই দুই উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। বরং, এর পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে, সামাজিক ইতিহাসের সন্দর্ভ-সৃজন আকাঙ্ক্ষা; সেইসূত্রে এর অন্তর্বয়নের অন্তহীন সম্ভাবনার প্রতি আসক্তি। একইসঙ্গে, ধূসর-সময়কে আঁকড়ে ধরে বর্তমানের মুখোমুখি হওয়ার যে আবর্তনমুখী প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী উপন্যাসসমূহে লক্ষণীয় (কখনো-কখনো পরবর্তী উপন্যাসেও পুনর্প্রাপ্ত), তা-ও যেন এই রচনাদ্বয়ে অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে সময় ও পরিসরের অনবরত অন্তর্বয়নের প্রবণতা ক্রমশ সক্রিয়। ফলে, জীবন ও জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যে বৈচিত্র্য ও বহুত্বে অবধারিত হয় তাকে উনিশ শতকের সমকালীন মূল্যবোধে জারিত করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসদ্বয়ের শিল্পসাফল্যকে সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সামন্ত-আধিপত্য ও সমষ্টিমুখ্য প্রতিবেশের মধ্যে এ ধরনের পাঠকৃতিতে পরিলক্ষিত হয় একদল মানুষের প্রবৃত্তি-তাড়িত ব্যক্তিমন, তাদের বেদনাসংক্ষুব্ধ অন্তরের অসহায়ত্ব। *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইলের* এই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত দার্শনিকতার শিল্পভঙ্গি নির্মাণে তাই অনিবার্যভাবেই ঔপন্যাসিককে ব্যতিক্রমী সংগঠনের উপমা-চিত্রকল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিষবৃক্ষ উপন্যাস থেকে সংকলিত উপমাসমূহের প্রতি বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এক অন্তর্লীন প্রতীকতার বিমূর্ত ব্যঞ্জনাকে লালন করাই এদের চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের মৌল প্রবণতা। উপমা উপ-তালিকার ১৫ থেকে ২৪ সংখ্যক এবং চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৮ ও ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের চিহ্নায়নের নান্দনিক সৌকর্য। উপমা উপ-তালিকার ১৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট নগেন্দ্রর এই অতিলৌকিক অনুভব মূলত বিবেকরুদ্ধ সামন্ত পুরুষের মনোগত স্থূলতাকে চিহ্নায়িত করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পর্যায়ে কুন্দ কখনোই নগেন্দ্রর কাছে তাঁর মানবিক সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়নি। এক বিহ্বল রূপানুরাগ নগেন্দ্রকে সাময়িককালের জন্য কুন্দর দিকে ধাবিত করেছে। এ কারণেই নগেন্দ্রর অনুভবে কুন্দ তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এক কল্পনাসর্বস্ব আবেশের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুন্দর প্রতি এই গভীরতা বিবর্জিত আকর্ষণ নগেন্দ্রর মধ্যে যে চরম অস্থিতিশীলতা অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছে তার ব্যঞ্জনাময় বিবরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। 'নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের' মধ্যে যে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান তার সঙ্গে মোহাবিষ্ট নগেন্দ্রর মনোপরিবর্তন ও অস্থিরতাকে উপমিত করা হয়েছে। ১৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিধৃত হয়েছে হীরার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের চিহ্নায়কসমূহের শিল্পিত সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জা। বিশেষত 'পদ্মপলাশলোচনা' পদবন্ধটি সূচনা অংশ থেকে সমগ্র পাঠকৃতিতে হীরা চরিত্রের বিশেষণরূপে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় তা সম্প্রসারণ করেছে ভিন্নধর্মী প্রতীকী আবহ। ফলে, উপমাটির সূত্রে সংদ্যোতিত হয়ে উঠেছে বহুস্বরের আবাহন। ১৮ ও ১৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে, সূযমুখীর অন্তর্জাত বেদনা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণহীন নগেন্দ্রর নিষ্ঠুর আচরণ সুবিন্যস্ত বিশেষণ সজ্জায় রূপায়িত। পরনারী আসক্ত নগেন্দ্র এবং সূর্যমুখীর বৈবাহিক অবস্থানকে খাদ্য-খাদকের নির্মম সম্পর্কের আলঙ্কারিক চিহ্নায়কের সাহায্যে স্পষ্ট করেছেন। 'আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি'— নগেন্দ্রের এই অকপট লজ্জাশূন্য উক্তি যেন সুতীক্ষ্ণ ব্যাঘ্রদন্তের মতোই মরণাঘাত করেছে সূর্যমুখীর দাম্পত্য-অস্তিত্বকে। আলোচ্য উপমার সূত্রে বিন্যস্ত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন বঙ্কিম উপন্যাসের অধিকাংশ বিমূঢ় পুরুষচরিত্রের মতো নগেন্দ্ররও সামান্য লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে, অপরদিকে, প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণায় কাতর সূর্যমুখীর মধ্যেও ব্যথা ও ক্ষোভের আঘাত অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। তবে, নগেন্দ্র চরিত্রের শিল্পসাফল্য নিহিত রয়েছে তাঁর আত্মোপলব্ধিতে, অনুতাপের যন্ত্রণায়:

> সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর একজনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?
> তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব? (দ্বাত্রিংশতম পরিচ্ছেদ)

নগেন্দ্রর এই অন্তরসংকট কুন্দনন্দিনীকে আরও বেশি অসহায় ও নিরস্তিত্বের অভিমুখী করে তুলেছে। উপমা উপ-তালিকার ২০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নগেন্দ্রের মনোপরিত্যক্তা কুন্দর জীবন-পরিণতির নির্দেশনা প্রকাশ পেয়েছে। নগেন্দ্র-কুন্দর সম্পর্ককে বালক ও তার খেলনার চিহ্নায়কের মাধ্যমে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়তো ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রর প্রবৃত্তি-সমর্পণকে লঘু দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

এই নিষ্ঠুর আচরণে বেদনাহত কুন্দর মানসিক অবস্থা এতে ঢাকা পড়ে যায়নি। বরং কুন্দর অসহায়ত্ব এবং করুণ পরিণতির নির্দেশনায় এই দৃষ্টান্ত সার্থক ভূমিকা পালন করেছে। পুরুষের প্রতি নারীর রূপজমোহ 'কার্পাশবস্ত্র' এবং 'তপ্ত অঙ্গার' এ দুই চিহ্নায়কসূত্রে সংকেতিত হয়েছে ২১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। বঙ্কিম উপন্যাসে রূপজমোহ প্রধানত আবেগ-আক্রান্ত নারী-পুরুষের সাধারণ লক্ষণ। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নারীর এ রূপজমোহ এবং পরিণামে প্রতিশোধকামিতায় জর্জরিত এক অমোঘ অন্ধকারে তার নিমজ্জন শিল্পিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত সামন্ত পরিকাঠামোর সীমায় কুন্দনন্দিনী-নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর ত্রিভুজ প্রণয়সূত্রে যা প্রায়-নির্দ্বন্দ্ব আখ্যানে অবসিত হতে পারতো, তা যে আরো একাধিক মাত্রায় নান্দনিক হয়ে উঠেছে, এর মূলে রয়েছে হীরা এবং দেবেন্দ্রের পরস্পরবিচ্ছিন্ন এক-পাক্ষিক প্রণয়-তৃষ্ণা। এক কুটিল সক্রিয়তা ও অপ্রতিরোধ্য প্রণয়াসক্তিতে হীরা চরিত্রের যে বিন্যাস, তার চিহ্নায়নে আলোচ্য দৃষ্টান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একইসঙ্গে, দেবেন্দ্রের সীমাবদ্ধ ক্রিয়াশীলতার আবেশ উপন্যাসটিকে কীভাবে বহুস্বরিক করে তুলেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়ার যন্ত্রণা এবং এই অপ্রাপ্তির অন্তরালে হীরার ভূমিকা তার প্রতি দেবেন্দ্রকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। এ কারণেই ইন্দ্রিয়বশ দেবেন্দ্র যৌনসম্ভোগের সূত্রে হীরাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করবার এক অতি স্থূল পরিকল্পনা গ্রহণ করে— যাকে আলোচ্য উপমায় মক্ষিকাসন্ধানী ঊর্ণনাভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেবেন্দ্রের 'বন্যার জলের মত' প্রেমের স্বরূপ যখন হীরার সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে, তখন তা মৃত-অস্তিত্ব হীরাকে করে তোলে আত্মনিয়ন্ত্রণবিমুক্ত, ফলে উপন্যাসের স্বয়ংক্রিয়তায় অনিবার্য হয়ে ওঠে কুন্দনন্দিনীর জীবনাবসান। সুতরাং, আলোচ্য উপমার সূত্রে *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের পরিণতির আভাস অত্যন্ত শিল্পিতভাবে চিহ্নায়িত করা সম্ভব। এই উপন্যাসে নিষ্পাপ অথচ অসহায় যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্রদ্বয় হল সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনী। সামন্ত সমাজের অসম মূল্যবোধের কাছে বলি হতে হয়েছে সূর্যমুখীকে, আর এক কার্যকারণহীন অতিপ্রাকৃত নিয়তিতাড়নায় জর্জরিত হয়ে আত্মবিসর্জনে বাধ্য হয়েছে উন্মূলিত কুন্দনন্দিনী। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়,

> যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। (দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

মূলত কুন্দনন্দিনীর এই নৈঃসঙ্গ্য ও মৃত্যুময়বোধের চিহ্নায়ন সম্প্রসারিত হয়েছে ২৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। প্রতিহিংসাবশত হীরা কৌশলে কুন্দনন্দিনীকে বিষ প্রয়োগ করতে চেয়েছে। কিন্তু সরল কুন্দনন্দিনী এই গোপন ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে পারেনি। সম্ভবত, এ রহস্য-উন্মোচন তার জীবনদর্শনে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাও রাখত না। কেননা, তার প্রতি নগেন্দ্রের মোহভঙ্গ এবং নির্মম প্রত্যাখ্যান তাকে আপন জীবন সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল, দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব নিহত হয়েছিল। এ কারণে, হীরার সূত্রে পাওয়া গরল সে যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গনের উৎসাহে পান করেছে। কুন্দনন্দিনীর এ মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র চিহ্নায়িত করেছেন আমিষলোলুপ বিড়ালের সঙ্গে। নগেন্দ্রর প্রতি কুন্দনন্দিনীর যে প্রচ্ছন্ন রূপানুরাগ, নিয়তির প্রাক্-নির্দেশনায় সে অনুরাগের মধ্যে সংগুপ্ত শঙ্কা, নিজে নিষ্ক্রিয় থেকেও নগেন্দ্রর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ— এর কোনোটিই কুন্দনন্দিনীর

Dhaka University Institutional Repository

জীবনার্থকে দ্বন্দ্বময় কিংবা দোলাচল-আলোড়িত করেনি। বরং, প্রায়-নির্দ্বন্দ্ব প্রেম আর একমাত্রিক নিয়তি চেতনার কারণে তার মৃত্যুবোধের কোনো মর্মস্পর্শী রূপায়ণও এই পাঠকৃতিতে বিন্যস্ত হয় না। বরং অবপ্রাণীর স্থূল অথচ একনিষ্ঠ জৈবিক আচরণের আশ্রয়ে ঔপন্যাসিকের যথেষ্ট সহানুভূতি ব্যতিরেকেই কুন্দনন্দিনীর পরিণতিকালীন চিহ্নায়ন উপস্থাপিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনার চূড়ান্ত মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নির্বিকল্পভাবেই আলঙ্কারিক ভাষার শিল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করেন। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। (ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ)

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু অনুতাপদগ্ধ নগেন্দ্র এবং পাতিব্রত্যে পুনর্স্থিত সূর্যমুখীর জীবনে কোনো অমোচনীয় সংকট কিংবা দ্বিধার প্রচ্ছায়া বিস্তার করে রাখল কি না তার কোনো শৈল্পিক ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক প্রদান করেন না। বরং উন্মাদিনী হীরার বেদনাদগ্ধ বিহ্বলতার রূপায়ণের মধ্য দিয়েই এ উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসের চিত্রকাল্পিক বিন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শৈল্পিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কুন্দনন্দিনীর গঠনগত অপূর্ণতা, তার প্রতিবন্ধী মনোজগৎ, সর্বোপরী সংকটাপন্ন ব্যক্তিত্বের আগ্রাসন অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র রূপায়ণ করেছেন চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। অতি সংক্ষিপ্ত বক্যিক গঠনে ঔপন্যাসিক কুন্দর করুণাসঞ্চারী মৃত্যুসংবাদকে পাঠকের সামনে অপরিস্ফুট ফুলের চিহ্নায়কে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত, এই প্রস্ফুটনের অপূর্ণতার মধ্যেই কুন্দর জীবনসমগ্রের আখ্যান উচ্চকিত। কুন্দর এই পরিণতির আভাস যেমন বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সূচনাতেই অতিলৌকিক দৃশ্যের অবতারণায় নির্দেশিত, তেমনি ভিন্ন চিত্রকল্পে সর্ববঞ্চিত হীরার জীবনমুখী সংক্ষোভকেও ইঙ্গিতাত্মক-রূপায়ণে উপস্থাপিত। এরই প্রমাণ চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৮ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। আপাতদৃষ্টিতে চিত্রকল্পটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতি বর্ণনার কোনো সরল চিহ্নায়ক। কিন্তু উপন্যাসের সামগ্রিক আখ্যান-প্রকৃতি বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য শব্দগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে এক প্রতিশোধপ্রবণ নারীর অন্তহীন জীঘাংসা নিবৃত্তির অস্পষ্ট আভাস। বস্তুত, হীরার আদ্যন্ত সক্রিয় জটিল কর্মকুশলতার যে প্রধানতম উপদান— প্রেমসঞ্জাত অসূয়াবহ্নি; তাকেই যেন একটি বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতের মতো চিত্রকাল্পিক আবহে এখানে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। বিশেষত, মেঘমালার বস্তু পরিপ্রেক্ষিতে 'হ্রস্বদীপ্ত সৌদামিনী' এবং 'স্ত্রীলোকের ক্রোধ' এ দুয়ের অভেদ কল্পনার মধ্য দিয়ে চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের বহুপ্রতিসম বিন্যাস অত্যন্ত শিল্প-সংসক্ত অবয়বে আলোচ্য দৃষ্টান্তে উপস্থাপিত। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহারের যে স্বাতন্ত্র্য উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহের সূত্রে বিশ্লেষিত হল তা সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাসেরই নান্দনিক উৎকর্ষের স্মারক।

Dhaka University Institutional Repository

[ঙ] কৃষ্ণকান্তের উইল

কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প সজ্জার অন্তরালে সক্রিয় এক প্রগাঢ় দ্বান্দ্বিক সমাজেচেতনা, যা ঔপন্যাসিকের মূল্যবোধ এবং নীতিবিবেচনার দ্বারা একান্তভাবে প্রভাবিত। বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অর্জিত বিশ্বাস, মানবিকতা এবং কাম্যবোধ-এর জটিল বিন্যাসের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এ উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প। তবে, আলোচ্য পাঠকৃতিতে, দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিমানসের ক্রিয়শীলতা যতখানি বিদ্যমান, চরিত্রসমূহের মনোজাগতিক সংকটের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ততখানি স্পষ্ট নয়। একারণে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর চরিত্রবিশ্লেষণে সমাজভাবনার তুলনায় তাদের মনোজাগতিক প্রেক্ষাপটটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোকিত। এর প্রভাব এই উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্পের সংগঠনেও বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছে। আখ্যান-বর্ণনায় তাই আলঙ্কারিক পদবিন্যাসের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও সার্থক ও পূর্ণায়তন উপমা-চিত্রকল্পের সংখ্যা ব্যাপক নয়। এমনকী কখনো-কখনো চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের বৈচিত্র্যবিহীন প্রতিসাম্য সৃষ্টির প্রবণতাও বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও উপর্যুক্ত উপমা উপ-তালিকার ৩৫ থেকে ৪০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপমা-রচনা-কুশলতার ভিন্নমাত্রিক দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের অপূর্ণতা আর অচরিতার্থতার ভারে ন্যুব্জ রোহিণীর জীবনকে ছন্দময়, ঋদ্ধ 'পালভরা জাহাজের' কূটাভাসে উপস্থাপন করা হয়েছে ৩৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। বিধবা রোহিনীর জীবনে যে বিশাল শূন্যতা বিদ্যমান, তাকেই ঔপন্যাসিক এ পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় সংকটের উৎসরূপে চিহ্নিত করেছেন। আলোচ্য দৃষ্টান্তে উল্লেখিত 'বকুলের মালা' কিংবা 'কোকিলের ডাক' রোহিনীর জীবনের এই নির্বেদকেই আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। একইসঙ্গে, তার অকুণ্ঠ জীবনপ্রত্যাশা, গোবিন্দলালকে আশ্রয় করে আরেকবার জীবনকে আহ্বান করবার সাধ যেন এই দৃষ্টান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত। রোহিণীর এ অফুরান জীবনাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে গোবিন্দলালের সীমাবদ্ধ মানসিকতা যেমন এই উপন্যাসে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা পেয়েছে, তেমনি গোবিন্দলালের দৃষ্টিকোণে ভ্রমর ও রোহিণীর তুলনামূলক মানসিকতাও ৩৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তের সহায়তায় চিহ্নায়িত হয়েছে। লক্ষণীয়, মন্ত্রমুগ্ধ সাপের উপমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই দৃষ্টান্তে একদিকে রোহিনী সম্বন্ধে গোবিন্দলালের অভিব্যক্তি রূপায়িত হয়েছে, অপরদিকে ভ্রমরের নিখাঁদ প্রেমকে মধুলোলুপ ভোমরার সঙ্গে তুলনা করবার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে গোবিন্দলালের স্লাঘাপূর্ণ মানসিক দীনতা। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে সামন্তকাঠামো লালিত এই মানবিক সংকটকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে ৩৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বারুণীর জলে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। এই দৃষ্টান্তে জলনিমগ্না রোহিণীকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে স্বচ্ছ স্ফটিকাকার হৈম প্রতিমার সঙ্গে। বস্তুত, এই উপমান অনুষঙ্গের মধ্যে মূলত নিহিত আছে, গোবিন্দলালের হৃদয়ে ক্রমশ জেগে-ওঠা মোহাবিষ্ট সৌন্দর্যচেতনা; রোহিণীর মনোজগৎকে অনায়াসে স্পর্শ করতে পারার অর্থহীন আত্মবিশ্বাস। একইসঙ্গে, শ্যামলবরণা স্ত্রী ভ্রমরের মধ্যে যে রূপসৌন্দর্যকে গোবিন্দলাল অন্বেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই স্থূল অতৃপ্তি প্রশমিত হতে চেয়েছে রোহিণীর আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর মধ্যে। বস্তুত, গোবিন্দলালের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক মূলত এই উপমার সাহায্যে এক বহুস্বরিক আবেদন সঞ্চার করেতে চেয়েছেন। কেননা, এতে একদিকে রোহিণীর চারিত্র্য যেমন উদ্ভাসিত, তেমনি গোবিন্দলালের মোহাবেশও সূক্ষ্মরূপে নির্দেশিত। গোবিন্দলালের কাছ থেকে বিধবা রোহিণীর প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমবঞ্চনা তাকে আত্মহননের আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাণিত করলেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এক অনিঃশেষ প্রেমমাধুর্যে সে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই রোহিণীর এই অনিঃশেষ জীবনাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে গোবিন্দলালের দৃষ্টিকোণে এই সলিল-শায়িতা রোহিণী প্রথম সুতীব্র রূপজমোহে আচ্ছন্ন করে তাকে। বলা যেতে পারে, এই উপমার সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দলালের মোহাবিষ্টতাই চিহ্নিত, যার ধারবাহিকতা লক্ষ করা যায় ৩৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। মেঘমালা কিংবা প্রথমবর্ষার মেঘদর্শন এবং চাতক কিংবা ময়ূরের চিহ্নায়ক ব্যববহারের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে রোহিণী এবং গোবিন্দলালের সমাজমনস্তাত্ত্বিক অবস্থান চিহ্নায়িত করা হয়েছে। চাতক মেঘ-প্রত্যাশী, কিন্তু মেঘ চাতক-প্রত্যাশী নয়। একই কথা নববর্ষা ও ময়ূরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই চাতকের পিপাসা নিবারণের মতোই রোহিণীকে আত্মস্থ করে মোহ-পিপাসা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দলাল তার প্রতি সকল আকর্ষণ হারিয়েছে। অগভীর সংকট ও সন্দেহের ধোঁয়াশা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে, গোবিন্দলাল নিজ হাতে রোহিণীকে হত্যা করেছে। অনিঃশেষ জীবনাকাঙ্ক্ষী রোহিণীর আকুল অনুনয়ও তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।—

> রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নতুন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!" (দ্বিতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ)

বস্তুত, আলোচ্য উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প এবং এদের অনুষঙ্গী আলঙ্কারিক ভাষার প্রয়োগ-দক্ষতা কেবল রোহিণী এবং গোবিন্দলালের গভীরতাশূন্য মোহাবিষ্ট প্রেমসম্পর্ককেই নয়, একইসঙ্গে, গোবিন্দলালের অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের আর্তিও বিভিন্ন আলঙ্কারিক বিশেষণে উপস্থাপিত। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, উপমা উপ-তালিকার ৪০ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র এ দৃষ্টান্তে উপস্থাপন করেছেন গোবিন্দলালের অন্তহীন যন্ত্রণার বাণী-অবয়ব। উপন্যাসে ভ্রমেরর বেদনা, তাঁর ব্যক্তিত্বময় জীবোনবোধ এ সকলকিছু সীমিত পরিসরে হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আবেদন সঞ্চার করেছে। তাঁর যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুকে বঙ্কিমচন্দ্র কবিত্বময় ভাষায় উপস্থাপন করেছেন এই রচনায়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল— ছয় বৎসর পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

ভিন্নতর সংবেদনায় প্রদীপের এই ব্যবহার এক চিত্রকল্পপ্রতীপ আবেদনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সূত্র ধরেই বলা যায় যে, *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে ব্যবহৃত বিবিধ শিল্প-উপকরণ মূলত আখ্যানের শিল্পসাফল্যকে নতুনতর মাত্রায় প্রতিভাসিত করবার প্রয়াস পেয়েছে।

[চ] চন্দ্রশেখর

অপরিসীম প্রেমময় জীবনাকাঙ্ক্ষা আর দুর্লঙ্ঘ্য নীতিবোধের দ্বৈরথে *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া ক্রমবিকশিত। উপমা ও চিত্রকল্পের সমন্বয়ধর্মী বিন্যাসে এই উপন্যাসের শিল্প-স্বাতন্ত্র্য অধিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্ফুট। সংকলিত উপমা ও চিত্রকল্প উপ-তালিকার অন্তর্গত দৃষ্টান্তসমূহ লক্ষ করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপমা উপ-তালিকার ২৬ থেকে ২৯ সংখ্যক দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চিহ্নায়ক চিহ্নায়িতের বিন্যাসে তথা উপমাসমূহের সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জায় মূলত বহুব্যবহৃত প্যারাডাইমগুচ্ছ বিদ্যমান। তবে, এই সকল দৃষ্টান্তের অনুষঙ্গে শৈবলিনী ও প্রতাপের অস্থির মনোপরিস্থিতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একইসঙ্গে, সমগ্র পাঠকৃতির গতিপ্রকৃতি নির্দেশনায় এ সকল উপমার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের রূপানুরাগ এবং তৎজাত ভালবাসা পাঠকৃতিতে বিধৃত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কেন্দ্রীয় প্রভাবক। অপরদিকে, প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমের মাধুর্য-প্রকাশও আলোচ্য পাঠকৃতিতে জালিকাসদৃশ বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতাপ-শৈবলিনী উভয়ই পরস্পরকে অবচেতনায় গভীরভাবে ভালবাসলেও সচেতন প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে যে যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ববিদ্ধ মানসিক অনুভবকে তারা আলিঙ্গন করেছে, তার আশ্রয়েই বিস্তৃত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অবভাস। আর এরই অন্তর্প্রদেশে তিনি চিহ্নায়িত করেছেন প্রতাপ, শৈবলিনী এবং বিশেষভাবে চন্দ্রশেখরের সংকটময় মনোপরিস্থিতি। ২৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে লরেন্স ফস্টরের শৃঙ্খল থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত শৈবলিনীকে প্রতাপ যেন নবীনদৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছে। তাই, ঔপন্যাসিক দীর্ঘ বর্ণনায় বর্ষা থেকে শরতের প্রলম্বিত বস্তু-পরিপ্রেক্ষিত সৃজনের মধ্য দিয়ে প্রতাপের এই রূপতৃষ্ণাজাত প্রেমকে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। শৈবলিনীকে পদ্মের উপমানে চিহ্নায়িত করে লেখক যেন কণ্টকবিদ্ধ সৌন্দর্যের ইমজেকে শৈবলিনীর জীবনের সঙ্গে সমীকৃত করতে আগ্রহী। কিন্তু প্রতাপের এ প্রগাঢ় সৌন্দর্যতৃষ্ণা পূর্বাপর সংকটাপন্ন, এক অন্তহীন বেদনা তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়িয়েছে। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর অবচেতনালালিত প্রেমানুভবের না-বোধক সচেতন প্রকাশ, কখনো-বা হঠাৎ প্রকাশ-পাওয়া ক্ষোভের আভাস উভয়ের হৃদয়কেই করেছে রক্তাক্ত। এরই নান্দনিক প্রকাশরূপ ২৭ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। প্রতাপ-শৈবলিনীর যুগলবদ্ধ আত্মহত্যার প্রচেষ্টার সূত্র ধরে যে ব্যতিক্রমী প্রেমানুভবের যাত্রা সূচিত হয়েছিল, চন্দ্রশেখর কর্তৃক শৈবলিনীর বিবাহ, প্রতাপ অন্বেষণে ইংরাজ ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর বসবাস এ সকলকিছুই আলোচ্য পাঠকৃতিতে বিস্তার করেছে দ্বন্দ্বের বিন্যাস। ফলে, শৈবলিনীর সচেতন প্রত্যাখানে প্রতাপের মনোবিশ্ব যে নতুন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়, তাকেই বৃশ্চিকতুল্য আঘাতের চিহ্নায়কে শিল্পিত করে তোলা হয়েছে। সমগ্র পাঠকৃতিতেই শৈবলিনী এক উৎকেন্দ্রিক জীবনাভিযানে আন্দোলিত। তাই প্রতাপের প্রতি তার আঘাত যেমন সত্য তেমনি এক অনিঃশেষ সুষুপ্ত ভালবাসায় শৈবলিনীর হৃদয়তলে প্রতাপের অস্তিত্ব সুচিহ্নিত। অথচ, চন্দ্রশেখরের প্রতি পাতিব্রত্যের নৈতিক দায় থেকেও সে মুক্ত নয়। এ কারণেই অবচেতনালালিত প্রেমানলে আত্মাহুতির স্বপ্নসাধ থেকে সচেতনভাবে বিচ্ছিন্ন হতে, শৈবলিনী অনুভব করেছে এক সচেতন অন্তর-তাড়না। এই দ্বন্দ্বময় উপলব্ধিই দাবানলগ্রস্ত অরণ্য এবং জীবনায়ু-প্রত্যাশী প্রাণীর সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে ২৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রতাপের চেতনায় শৈবলিনী আমৃত্যু তার চিরকাঙ্ক্ষিতারূপে সক্রিয় থেকে গেছে। কোন মিলনের প্রত্যাশা নয়, বরং বিসর্জনের আবেগেই সে শৈবলিনীকে প্রতিষ্ঠা করেছে আপন হৃদয়গভীরে। সে বিশ্বাস করেছে, 'আমার ভালবাসার নাম— জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা'। উপন্যাসের সূচনায় যে যুগল আত্মবিসর্জনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছিল, সেই যুগলের যন্ত্রণাকে কেবল নিজের মধ্যে ধারণ করেই এভাবে প্রতাপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর-এর মধ্যে যে বহুভূজ প্রতিসম্পর্ক বিকশিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত, তার আভাস বহন করে চলেছে পাঠকৃতিতে বিন্যস্ত চিত্রকল্পসমূহ। প্রসঙ্গত, চিত্রকল্প উপ-তালিকার অন্তর্গত ১০ থেকে ১৩ সংখ্যক দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। ১০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে লরেন্স ফস্টরের দৃষ্টিকোণে নির্মিত, বীভৎস চিত্রকল্পটি মূলত পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় তার জীবনের চরম দুর্বিপাক সংঘটনের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করেছে। প্রতাপ কর্তৃক তার পরাজয় ও লাঞ্ছনার পূর্বাভাসরূপে আলোচ্য দৃষ্টান্তটি ব্যবহৃত হয়েছে। ১১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পুনরায় ঔপন্যাসিক অভিব্যঞ্জিত করেছেন শৈবলিনীর দ্বান্দ্বিক সংকট ও অস্থির মনোসংবেদনাকে। শৈবলিনী যেন বারবার আত্মদর্পণে প্রতাপের ছায়া ফেলে নিজের সঙ্গে মীমাংসিত হতে চেয়েছে; হঠাৎ কখনো অবচেতনা-আবৃত প্রেমাকাঙ্ক্ষা উদ্ভিন্ন হয়েছে তার হৃদয়ে। শৈবলিনীর এই সংকটবহুল জীবনের অভিক্ষেপ উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্ত। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফস্টর আমার কে? (দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু এ সমাধানহীন প্রচেষ্টা তাকে কেবলই করেছে ক্ষত-বিক্ষত; নৈতিকতার কাছে আত্মসমর্পণে সে বাধ্য হয়েছে। তবুও সীমাহীন জীবনাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত অবয়বে যে অনির্বাণ ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে শৈবলিনী ধারণ করে চলেছে তারই প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর এর ত্রিমুখী মনোসম্পর্ক বাল্যপ্রেম এবং স্বামিত্বের দ্বৈরথে যে জটিল পথ পরিক্রমা করেছে তা-ই এই চিত্রকল্পে পুষ্পবৃন্ত-চ্যুত ফুলের রূপকে শৈল্পিক হয়ে উঠেছে। প্রতাপ-শৈবলিনীর সংকটময় প্রেমসম্পর্ক এবং এরই সূত্রে ঘটনাপরম্পরায় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহ, অথচ প্রতাপের অন্বেষণে শৈবলিনীর দুঃসাহসিক অভিযান, পুনরায় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সাক্ষাৎ এ-সকল কিছুই যেন আলোচ্য চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে রূপকায়িত। চিত্রকল্পের বিন্যাসে ফুলের অনুষঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সুলভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চিত্রকল্পে বিন্যস্ত সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জা নিঃসন্দেহে বঙ্কিম-রচনায় এক বিশিষ্ট অবস্থানে চিহ্নিত। তবে প্রতাপ-শৈবলিনীর দ্বান্দ্বিক মনোসম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধের আরোপে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত। ১২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বাল্যস্মৃতি জাগানিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতাপ ও শৈবলিনী ক্ষণকালের জন্য আপন প্রেমাবেগের কাছে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ হলেও তা কোনো ইতিবাচক পরিণতির পথে এগিয়ে যায়নি। এমনকী দ্বিতীয়বার যুগল-আত্মহননের প্রস্তাবও শেষপর্যন্ত শৈবলিনীর মূল্যবোধের নির্মোকে প্রত্যাখ্যাত হয়:

> শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"
>
> ... প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল— বলিল,"প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

আকস্মিক নীতিবোধের কারণে প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্বন্ধ আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও যে ট্রাজিক বেদনার আভাস এর অন্তস্তলে অনুরণিত তা-ই মূলত উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক।

[ছ] আনন্দমঠ

হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান আর এর অন্তর্স্রোতে অনিঃশেষ প্রেমতৃষ্ণার দ্বান্দ্বিক বিন্যাস *আনন্দমঠ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রবণতা। এই রচনায় সনাতনধর্ম-আশ্রিত নীতিমূলকতা এবং হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী নানাবিধ উদ্দীপনা ও উৎসাহ মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও কখনো-কখনো আলঙ্কারিক ভাষার আলোকচ্ছটা একে শিল্প সফলতার অভিমুখবর্তী করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের প্রায় সকল উপন্যাসেই উদ্দেশ্যমূলকতা প্রকট হয়ে উঠলেও এক অমোচনীয় শিল্পসত্তায় তিনি চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন। আলোচ্য উপন্যাস এর ব্যতিক্রম নয়। এরই উজ্জ্বল প্রমাণ উপমা উপ-তালিকার ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। প্রথমটিতে সন্তানধর্মে সর্বস্ব পণ করেও জীবানন্দ আপন স্ত্রী শান্তিকে ত্যাগ করতে পারেনি। প্রেমানুভবের তীব্রতায় সে কাজের ছলে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রামে গেছে। এক আবেগময় মুহূর্তে দেশ আর কাঙ্ক্ষিতা নারী তার চেতনায় একীভূত হয়ে গেছে। অন্যদিকে পুরুষবেশী শান্তির আশ্রমে আগমনের মধ্য দিয়ে জীবানন্দের কাছে ব্রত পালনের চেয়েও প্রণয়িনীর প্রেমানুভূতিই চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। এ কারণেই প্রেমিকা, পরাধীন দেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে একসময় দেশ অপেক্ষাও অধিক বাঞ্ছনীয় রূপে জীবানান্দের সম্মুখে আবির্ভূত। জীবানন্দের এই মনোসংবেগই আলোচ্য দৃষ্টান্তে চিহ্নায়িত। বিন্যাসের ব্যতিক্রমধর্মিতা ৪৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে যোজিত করেছে বৈশেষিক মাত্রা। আশ্রম প্রধান সত্যানন্দের নিকট শান্তির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সহজাত লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যাওয়ার বিবরণ যে সুললিত সিনট্যগম্যাটিক বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য। অনুরূপভাবে, ৪৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রত্যাখ্যাত ভবানন্দ, কল্যাণীর প্রেম-প্রত্যাশায় আমৃত্যু প্রাণজ দ্যোতনা অনুভব করেছে। আলোচ্য উপমায় কল্যাণীর রূপবর্ণনার প্রচ্ছদে মূলত ভবানন্দের রূপজমোহ উৎসারিত নিখাঁদ প্রেমের ট্রাজিক পরিণতিকে সুশৃঙ্খল প্যারডাইম গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে কল্যাণীকে ভবানন্দ জীবদ্দশায় সন্তানধর্মের বিনিময়েও আপন করে পায়নি, সেই কল্যাণীকে স্মরণ করেই সে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। মৃত্যুশয্যায় ভবানন্দের স্মৃতি তাড়নার অনেকান্তিক প্রেমাবেগকে শিল্পসূত্রে সমন্বিত করায় আলোচ্য উপমায় যোজিত হয়েছে চিহ্নায়নের বহুমাত্রা।

[জ] সীতারাম

সীতারাম উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সচেতন কল্পনা আর স্বদেশ-স্বরাজ্যকে ছাপিয়ে-ওঠা এক অন্ধ প্রণয়াবেগের অন্তর্স্রোতে বাহিত করেছেন বিবিধ শিল্প-উপকরণের নান্দনিকতা। উপমা উপ-তালিকার ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ সংখ্যক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েওঠে। ৪৮ এবং ৫০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর রূপ এবং মনোবৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে চিহ্নায়িত। প্রথমটি

Dhaka University Institutional Repository

আপাতভাবে, নিছক জয়ন্তীর রূপবর্ণনা করলেও এতে প্রযুক্ত প্যারাডাইমসমূহ একান্তভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। বস্তুত উনিশ শতকীয় নারীরূপ বর্ণনায় এরূপ উপমানের ব্যবহার তুলনাদুর্লভ। সেইসঙ্গে এর মধ্য দিয়ে যেন ভাবিকালের বাংলা উপন্যাসে বহুব্যঞ্জনাময় ভাবমুখ্য উপমা ব্যবহারের সম্ভাবনাও সংগোপনে দ্যোতিত। ৩৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে জয়ন্তীকে সর্বসম্মুখে নগ্ন করে লাঞ্ছিত করবার যে উদ্যোগ সীতারাম গ্রহণ করেন তার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পরিণতির চিহ্নায়ন সংঘটিত হয়েছে। রক্ষকের ভক্ষকরূপে আবির্ভাব যেন প্রকারান্তরে *ইশপস ফেবেলসের* বাঘ ও বকের কথার আভাস দেয়। এ-কারণে বঙ্কিমচন্দ্রও সীতারামের চিহ্নায়করূপে বাঘকেই ব্যবহার করেছেন। ৪৯ সংখ্যক উপমায় সীতারামকে এক ভিন্ন আবহে খুঁজে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ গণনাসূত্রে যে স্ত্রী শ্রীকে একদিন সীতারাম পরিত্যাগ করেছিল, তাকেই রাজ্যের বিনিময়ে পেতে চেয়েছে সে। শ্রী হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে 'অনন্তের অংশ'। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্তের অংশ। নূতন তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে— অনন্তের অংশ। (প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

প্রতিবেশ ভিন্ন হলেও জীবানন্দ কিংবা ভবানন্দ চরিত্রের মধ্যেও এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সাযুজ্য সন্ধান করা কষ্টসাধ্য নয়। এ পরিণামহীন আকস্মিক রূপজ প্রেমানুভূতি নারী ও রাজ্যের অভেদ কল্পনায় সুবিন্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন উপমার চিহ্নায়নে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রতীক

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে প্রতীকের ব্যবহার প্রধানত কোনো শিল্পাদর্শ প্রভাবিত প্রচেষ্টার ফল নয় বরং তা ঔপন্যাসিকের সহজাত সৃষ্টিশীলতার উৎসারণে আকস্মিকভাবে রূপায়িত। বড় প্রতিভা মাত্রই কালান্তরের অভীপ্সায় আন্দোলিত, আর এ-কারণেই এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায় প্রতিভাবান সাহিত্যিকের লেখনি সৃজন করে বিশিষ্ট প্রতীক-সম্ভার— যার মধ্যে কোনো আদর্শিক দায়বদ্ধতা নেই, আছে কেবল নান্দনিক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতীক সম্বন্ধেও এ মন্তব্য একান্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর উপন্যাসে কখনো প্রতীকী তাৎপর্যে কোনো শব্দানুষঙ্গ অর্জন করেছে প্রতীকের মর্যাদা; আবার কখনো একই শব্দানুষঙ্গের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তা হয়ে উঠেছে প্রতীক। তবে, প্রায়শই সম্ভাবনাময় প্রতীকসমূহ কেবল ঔপন্যাসিক পরিচর্যার কৌশলরূপে ব্যবহৃত হয়েই অবসিত হয়ে গেছে। আখ্যানের ভাববীক্ষা, চরিত্র-চিত্রন কিংবা পরিণতি সংজ্ঞাপনের অপরিহার্য পন্থারূপে এদের ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটেনি। সুতরাং, বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রতীক প্রায়শই অপূর্ণ অবয়বে সংগুপ্ত, কেবল কখনো কখনো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে আয়ত্ত করবার সামর্থ্যে এরা সুচিহ্নায়িত। তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভার পর্যালোচনায় যে সকল প্রতীকী শব্দানুষঙ্গ নিজস্বতায় সদা-দীপ্ত, স্বতন্ত্র আলোচনা-সূত্রে তাদের নিচে ব্যাখ্যা করা হল:

প্রদীপ : আকস্মিকভাবে জ্বলে ওঠা আবার হঠাৎ করে নিভে যাওয়ার অনুষঙ্গে একাধিক বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রতীক চিহ্নরূপে প্রদীপকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনীর* সূচনাতেই এসেছে প্রদীপ নিভে যাওয়ার প্রসঙ্গ। বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত এই প্রতীকী অনুষঙ্গের সাহায্যে এক রহস্যময় অবগুণ্ঠনপ্রতিম প্রতিবেশের সংগঠন বিন্যাসে অভ্যস্ত। রোমান্স উপন্যাস যে রহস্যময়তার প্রতিবেশে কল্পবাস্তবতার স্পর্শে অতীতের সঙ্গে বর্তমান-ভবিষ্যৎকে সূত্রবদ্ধ করে, সেই অস্পষ্ট পরিবেশ-সৃজন প্রবণতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রতীক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে। কখনো আবার মনোলালিত স্বপ্ন ও ভাবী প্রত্যাশাভঙ্গের রসসমৃদ্ধ চিহ্নায়নেও এই প্রতীকচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, *দুর্গেশনন্দিনীর* প্রথম পরিচ্ছেদে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে দেবমন্দিরে প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘটনা বিমলা ও তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের আকস্মিক সাক্ষাৎ মুহূর্তকে মূলত শ্রবণ-সংজ্ঞাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর অন্তর্দেশে রয়েছে আসন্ন পাঠান ও রাজপুত

Dhaka University Institutional Repository

সংঘাতের অশনি-সংকেত, বৈধব্যের মধ্য দিয়ে বিমলার সংগুপ্ত দাম্পত্য-জীবনের অবসানসহ এক সুগভীর রহস্যাকুল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। ভিন্ন মাত্রায় এই পূর্বাভাস প্রদানের রীতি পুনরায় লক্ষ করা যায়, *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে স্বামী নবকুমারের সঙ্গে কাকতালীয় সাক্ষাতে, পরিচয় জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভে যাওয়ায় তার পরিত্যক্ত স্ত্রী, মতিবিবির স্বামী-অন্বেষণের সমাপ্তি নির্দেশের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, মোঘল শাসন-কেন্দ্রের নৈকট্য লাভে বঞ্চিত উচ্চাশাহত মতিবিবি তথা পদ্মাবতীর অন্তিম-আশ্রয় তার স্বামী: যার সঙ্গে পুর্নমিলনের সম্ভাবনায় সে ওই অনুসন্ধানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে নবকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল সেই মুহূর্তে সে সন্ধান-প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। আর তাই প্রদীপ নিভে গেল। অর্থাৎ, স্বামীর সন্ধান প্রাপ্তির সংকেতকে ব্যবহার করে চিহ্নায়ক প্রদীপ এবং চিহ্নায়িত আখ্যানধারার মধ্যে এক নতুনতর চিহ্নায়নের সেতুবন্ধন তৈরি করা যায়। যেহেতু এই চিহ্নগুলো বহুস্বরিক তাই ভিন্ন আকল্পেও এদের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘটনাক্রম তাই না-বোধক দৃষ্টিকোণেও ব্যাখ্যাযোগ্য। আকস্মিক সাক্ষাতে একজন বিবাহিত পুরুষরূপেই মতিবিবি নবকুমরাকে পেয়েছে। হয়তো প্রথম দর্শনে তাকে তার সম্ভাব্য স্বামী বলেও অনুমান হয়েছে, কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারেনি। তাই স্বামী-পুনর্মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা তার সুদীর্ঘকাল লালিত, তা জাজ্বল্যমান দীপশিখার মতো তার অন্তরকে আশার আলোয় আলোকিত করে রেখেছিল। কিন্তু যখনই সেই বিবাহিত পুরুষের নিবাস ও পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ সাময়িকভাবে হলেও স্বামী হারানোর বেদনায় তার সেই আশা-প্রদীপ নিভে গেছে। অর্থাৎ, প্রদীপ শব্দানুষঙ্গ প্রতীকী তাৎপর্যে বহুস্বরে দ্যোতিত হয়েছে *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে। আবার *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের প্রায় সূচনা অংশে কুন্দনন্দিনীর পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জ্বালানীশূন্য প্রদীপ নিভে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কুন্দনন্দিনীর অনিশ্চিত অসহায় অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে প্রতীকী আবহে চিহ্নায়িত। অপেক্ষাকৃত লঘুতর তাৎপর্যে *রাধারাণী* উপন্যাসে রাধারাণীর মায়ের জীবনাবসান সম্ভাবনাকে নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপের প্রতীকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র যেন এক অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় নির্বিকল্পভাবে প্রদীপের প্রসঙ্গকে নানাভাবে বিচিত্র প্রতীকে বিভিন্ন আখ্যানে ব্যবহার করেছেন।

পথ : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পথের অনুষঙ্গ সুলভ। *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে অশ্বারোহী জগৎসিংহের সূত্র ধরে পথের অনুষঙ্গ ব্যবহারের যে সূচনা ঘটেছিল তা বিভিন্ন উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিযানসদৃশ আকল্প সৃজনের মধ্য দিয়ে বহুব্যবহৃত হয়েছে। তাই সামান্য অর্থে এই পথ যেন বঙ্কিম উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ রসানুভূতির শিল্প-অভিমুখ নির্দেশ করে। কিন্তু *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে পথের অনুষঙ্গ স্বতন্ত্র প্রতীকতায় ব্যবহৃত, নান্দনিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ। সহযাত্রী-বিবর্জিত, কাপালিক-সংসর্গে অনাগ্রহী নবকুমার নিবিড় অরণ্যে যখন দিকশূন্য, পথবিভ্রান্ত— তখনই বনবালা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাতের প্রথম সংলাপই হল, ' পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'— যা কেবল তাৎক্ষণিক অলঙ্কার ব্যঞ্জনায় আন্দোলিত নয়, বরং এক অমোচনীয় প্রতীকী আবেশে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিধৃত। এই পথ হারাবার প্রতীকী অনুষঙ্গ তাই আর কেবল নবকুমারে সীমাবদ্ধ থাকে না; কপালকুণ্ডলাকেও এক লক্ষ্যহীন জীবনে নিপতিত করবার ইঙ্গিতকে চিহ্নায়িত করে। এমনকী মতিবিবির অসূয়ালালিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার পরিণতিশূন্য অবয়বও যেন এই পথ হারানোর দ্যোতনায় শিল্পরূপ লাভ করে। বস্তুত,

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের সূচনাতেই এই অনুষঙ্গের আবির্ভাব বঙ্কিমচেন্দ্রের পূর্ব পরিকল্পিত শিল্পীমানস-প্রবণতারই আভাস দেয়।

অতল জল : সুগভীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কিংবা সুতীব্র রূপজমোহে অনন্যপন্থী হয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা পারিবারিক সকল বৈভবকে প্রত্যাখ্যান করবার চিহ্নায়নে অতল জল প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা যেতে পারে এই জলজ অতলতায় সকল সুখ ও পার্থিব অর্জনকে বিসর্জন দেয়ার অন্তরালে অন্তহীন প্রেমাবেগে আত্মনিমজ্জনের সংবেগই মূলত প্রতীকায়িত। তাই *মৃণালিনী* উপন্যাসে হেমচন্দ্র 'রাজ্য-শিক্ষা-গর্ব'কে জলাঞ্জলি দিয়ে মৃণালিনীকে আপন করে পেতে অতল জলের প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তবে, এই শব্দনুষঙ্গের সর্বাধিক শিল্পসম্মত ব্যবহার হয়েছে *আনন্দমঠ* উপন্যাসে। পরস্ত্রী কল্যাণীর প্রতি রূপতৃষ্ণা উৎসারিত প্রণয়াবেগকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে ভবানন্দ সন্তানধর্ম, পরকাল, মহাব্রত এমনকী আপন নাম পর্যন্ত অতল জলে বিসর্জন দিতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত, লক্ষণীয়:

> ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।
> ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।
> ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।
> ক। তোমার সঙ্গে নাকি?
> ভব। বিবাহ করিবে?
> ক। তোমার সঙ্গে নাকি?
> ভব। যদি তাই হয়?
> ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?
> ভব। অতল জলে।
> ক। পরকাল?
> ভব। অতল জলে।
> ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?
> ভব। অতল জলে।
> ক। কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে?
> ভব। তোমার জন্য। দেখ মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ, সন্তানধর্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি , তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। (তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *আনন্দমঠ*)

এখানে অতল জল চিহ্নটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপাতভাবে, কোনো প্রতীকী আচ্ছাদন এ শব্দনুষঙ্গে ব্যবহৃত না হলেও এর পৌনঃপুনিক ব্যবহার একে বঙ্কিম-উপন্যাসের পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রনহীন প্রেমজসমর্পণকেই প্রতীকী অবয়বে চিহ্নায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

বিষবৃক্ষ : আলোচ্য প্রতীকী শব্দানুষঙ্গ কেবল *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসেই নানা ঘটনাসূত্রে আবির্ভূত হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিধবা কুন্দনন্দিনী সামন্ত-আভিজাত্যে বলিষ্ঠ নগেন্দ্রের গৃহে সূর্যমুখীর আগ্রহেই আশ্রয় লাভ করেছে। এই সাধারণ ঘটনাটিই সকলের অজান্তে উপন্যাসের অসামান্য দ্বন্দ্বের কেন্দ্রশক্তিতে সমীকৃত। কুন্দকে কেন্দ্র করে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সুললিত দাম্পত্য সম্পর্কে যেমন ছন্দ

Dhaka University Institutional Repository

পতন ঘটেছে, তেমনি হীরাকে ব্যবহার করে কুন্দ-প্রেমপ্রত্যাশী দেবেন্দ্রের কূটকৌশল সামগ্রিকভাবে এক বহুভুজ জটিল মানুষিক সংকটের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বহুমাত্রিক জটিলতার এই সূচনা মুহূর্তকে বিষবৃক্ষের বীজের প্রতীকে চিহ্নায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। এই জালিকাসদৃশ সাম্পর্কিক দোলাচলে লেখক তাঁর অন্বিষ্ট আকল্পের মধ্যে যে বিষাক্ত প্রতিবেশ ও ঘটনাপরম্পরাকে প্রোথিত করতে চেয়েছেন তারই প্রতীকরূপ এই বিষবৃক্ষ। উপন্যাসের পাঠকৃতিতে আখ্যান বর্ণনার ধারাবাহিকতায় তিনি বিষবৃক্ষের বীজ, চারা, বৃদ্ধি এবং ফলধারণ এ সকল কিছুকেই ধারাবাহিক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। লক্ষণীয়, আলোচ্য প্রতীকটির গঠন রূপক অলঙ্কারের আশ্রয়ে। কিন্তু বহুস্বরের ব্যঞ্জনায় এবং চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের পারস্পরিক সম্পর্কের আপাত সংযোগহীনতার আন্তঃস্তরিক বিন্যাসে শব্দানুষঙ্গের রূপকতা ক্রমশ প্রতীকের শক্তিতে পুনর্গঠিত হয়েছে। ফলে, এই শব্দানুষঙ্গ এক জৈব সমগ্রতায় উপন্যাসের পাঠকৃতিকে দান করেছে বিশিষ্ট প্রতীকী তাৎপর্য।

নৌকা: উপন্যাসের বিশেষ কোনো চরিত্রের বা চরিত্রসমষ্টির নিরুদ্দেশ অভিগমনের নান্দনিক রূপায়ণ প্রত্যাশায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীকী তাৎপর্যে নৌকা-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এর শিল্পসফল প্রয়োগ লক্ষ করা যায় *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে। আলোচ্য রচনায় একাধিকবার এই অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসের সূচনায় সহযাত্রীদের অকৃতজ্ঞ আচরণে নবকুমারের নৌকা থেকে আশ্রয়হীন অরণ্যে নির্বাসিত হওয়া যেন ঔপন্যাসিকের বাস্তব জীবনকাঠামো থেকে রোমান্সের জগতে অনুপ্রবেশের সংকেত বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্র অতীত কালের আশ্রয়ে রহস্যাবৃত বাস্তবাতিরেক রোমান্সের মধ্যে নিজের সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তিকে বাহিত করার যে শিল্পাকাঙ্ক্ষা লালন করেছিলেন তাকে সাহিত্যরূপ দিতে প্রয়োজন ছিল বাস্তব আর অ-বাস্তবের মধ্যে এক নান্দনিক সেতু নির্মাণ। এই উদ্দেশ্যকে শিল্পায়িত করে তুলতেই ব্যবহৃত হয়েছে নৌকার প্রতীক। সমগ্র *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক ও বিবিধ চরিত্রের মনোচেতনার আন্তর্জাগতিক পরিভ্রমণকে রূপায়িত করতে নৌকা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এ-কারণেই উপন্যাসের উপান্তে স্বপ্নের মধ্যে কপালকুণ্ডলা আসন্ন পরিণতির যে ভাবী নির্দেশনা লাভ করেছে তার বর্ণনায়ও ব্যবহৃত হয়েছে নৌকার অনুষঙ্গ। —

> বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল।

লক্ষণীয়, লেখক এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনোনির্দেশনায় ব্যবহার করেছেন উল্লিখিত 'কপালকুণ্ডলার নৌকা'-পদবন্ধ। বাস্তব প্রতিবেশের যে নৌকা থেকে বিচ্যুত হয়ে নবকুমার আরণ্যক রোমান্সের জগতে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, সেই সম্পর্ক পুনরায় বস্তুমানুষিক ঈর্ষা আর প্রাবৃত্তিক অচরিতার্থতার প্রেষণে নিমজ্জমান নৌকার মতোই কালের সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, *বিষবৃক্ষ* ও *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংকট সৃজন ও রোমান্সের আবহ সঞ্চারের উপায়রূপে ব্যবহৃত নৌকার অনুষঙ্গ তুলনা করা যেতে পারে। বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীল মনোবিন্যাসে বাস্তব থেকে রোমান্স এবং রোমান্স থেকে বাস্তবমুখী অভিযাত্রার রূপায়ণে ব্যবহৃত নৌকা প্রতীক বিশেষ তাৎপর্যে বিভিন্ন উপন্যাসে বিন্যস্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাজিতা ফুল : *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের ভ্রমর চরিত্রটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের সীমিতসংখ্যক ব্যক্তিত্বশালিনী নারী চরিত্রের অন্যতম। বলা যেতে পারে, প্রচলিত সংস্কার আর পাতিব্রত্যের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমর্পণ না করার যে দৃষ্টান্ত ভ্রমর প্রতিষ্ঠা করেছে তারই দ্যোতনা অনুরণিত হয়েছে অপরাজিতা ফুলের প্রতীকে। আর তাই 'অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া গেল'— এই সংক্ষিপ্ত অথচ বহুস্বরিক বাক্যে গোবিন্দলালের সংবাদপ্রত্যাশায় ব্যর্থ ভ্রমরের অভিমান ক্ষোভ আর যন্ত্রণা নীল অপরাজিতার ম্রিয়মাণ রূপের সাহায্যে সংকেতিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। *বিষবৃক্ষের* কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকে লেখক যেমন না-ফুটতেই-শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের ইমেজে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন, তেমনি এই ক্ষেত্রেও নারীর মলিন পরিণতির বর্ণনায় প্রতীকী তাৎপর্যে ফুল তথা অপরাজিত ফুলের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশ : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিবিধ প্রসঙ্গে স্বদেশ, স্বাধীনতা, এবং হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত। রোমান্সের যে কল্পনাসজ্জিত পৃথিবীতে তিনি আদ্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, তার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল আপন আদর্শে রচিত দেশ নামক অভিধার এক ইউটোপিয়ান কাঠামোকে শিল্পের সঙ্গে অন্বিত করা। বিশেষত, তাঁর অন্ত্যপর্বের উপন্যাসে সন্তানধর্ম কিংবা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী মনোবিশ্বাস যেভাবে রচনার শিল্পস্বভাবকে আচ্ছাদন করেছে, তাতে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে মাতৃরূপে পূজিতা স্বদেশ স্বভূমি যেন আরেক দেবীপ্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু এ আদর্শায়িত আকাঙ্ক্ষার অন্তর্দেশে ফল্গু ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিস্বভাবী ঔপন্যাসিক অনুভব। এ কারণেই তাঁর উপন্যাসে 'দেশ' বারবার আবেগবশ পুরুষের কল্পনায় সক্রিয় নারী অবয়বের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায়। বস্তুত, *দুর্গেশনন্দিনী* থেকেই ভারতীয় সামন্ত শাসনের শৌর্যকে পুনর্মূল্যায়ন করবার যে প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সুস্পষ্ট তাকেই তিনি স্বোপার্জিত আদর্শের সঙ্গে একীভূত করে পরবর্তী বিভিন্ন উপন্যাসে রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, *আনন্দমঠ* ও *সীতারাম* উপন্যাসের পাঠকৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। উভয় উপন্যাসের সমগ্র পাঠকৃতিতেই 'দেশ', কখনো কাঙ্ক্ষিতা নারী কখনো-বা স্বপ্নকল্পিত স্বর্গরাজ্যের প্রতীকতায় আবির্ভূত। তবে, কোনো উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ান্তভাবে স্বপ্নচারী কল্পনায় অবসিত হন না। বরং এক অলঙ্ঘনীয় ঔপন্যাসিক বাস্তববোধের কাছেই ঘটে তাঁর অন্তিম আত্মসমর্পণ। এ-কারণেই দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে গৃহীত কঠোর সন্তানধর্ম মানবিক আবেগের অতল জলে হারিয়ে যায়, হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েও শেষপর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কেস্টইনের মত আত্মধ্বংসে নিশ্চিহ্ন হয়। উপনিবেশের অবধারিত পরাধীনতার বেদনাকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনভাবেই রোমান্সের কোমল স্পর্শে প্রশমিত করতে পারেন না।

কীট : বঙ্কিম-উপন্যাসে বহুব্যবহৃত এই প্রতীক মূলত বহুত্বের দ্যোতনায় সঞ্চারিত। *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে নবকুমারের প্রতি মতিবিবির প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা হয়েছে এই প্রতীকের সাহায্যে। মোঘল রাজদরবার যার জন্য অবারিত-দ্বার, বাদশাহ জাহাঁগীরের নিকট যে মেহের-উন্নিসার সমকক্ষ-প্রতিম, সেই মতিবিবি সকলকিছু নবকুমারের জন্য পরিত্যাগ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে চেয়েছে। নবকুমারকে পাবার আশায় যে ঐশ্বর্যকে সে প্রস্তরকঠিন হৃদয়ে উপেক্ষা করেছে, সেই পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে অনন্যসমর্পিত প্রেম-কীটের আচ্ছাদনে। আবার মতিবিবির হৃদয়লালিত এই কীটই সুখী দাম্পত্যজীবন প্রত্যাশী নবকুমার-কপালকুণ্ডলাকে চালিত করেছে এক বিনাশী ভবিষ্যতের অভিমুখে;

Dhaka University Institutional Repository

মতিবিবিকেও তা কোনো সুখ-পরিণতির দিকে ধাবিত হতে দেয়নি। অর্থাৎ, এক অন্তহীন যন্ত্রণাবোধের সংকেতে আলোচ্য কীট অনুষঙ্গ সমগ্র উপন্যাসের নির্যাসকে প্রতীকে ধারণ করতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাঁর মনঃ মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল। (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, *কপালকুণ্ডলা*)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কীট সর্বদাই অচরিতার্থ প্রেমের যন্ত্রণাবোধকে সংকেতিত করে। এ কারণেই, *রাজসিংহ* উপন্যাসে মোঘল শাহজাদী জেব-উন্নিসার রুদ্ধ প্রণয়, মবারকের প্রতি তার একপাক্ষিক ভালোবাসা এ সকলকিছুকে প্রকাশের জন্য লেখক এই কীট প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।—

> শয্যায় পিপীলিকা, কি অন্য একটা কীট ছিল— রত্নশয্যাতেও কীটের সমাগেমের নিষেধ নাই— কীট জেব-উন্নিসাকে দংশন করিল। (অষ্টম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

এই কীটের অনুপ্রবেশ বরাবরের মতোই আপাতভাবে সুখপরিমলবাহী। তাই মৃত্যুমুখ প্রত্যাবর্তিত মবারক ক্ষণিকের রূপজমোহে বশীভূত হয়ে জেব-উন্নিসার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাকে বিবাহের মাধ্যমে এক নতুনতর জটিলতার মধ্যে আখ্যানকে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু কীট অনুপ্রবেশের পরিণতি সর্বদাই দুঃসহ মানুষিক বেদনাবোধের অনুগামী। এরই ফল স্বরূপ উপন্যাসের শেষে ধ্বনিত হয় উন্মত্তা দরিয়া বিবির আর্তনাদ। সুতরাং, এক অনিঃশেষ দহন-পরিণামী দ্যোতনায় আলোচ্য অনুষঙ্গ পৌনঃপুনিকভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে বঙ্কিম-উপন্যাসে।

বিড়াল : *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে ভ্রমর-গোবিন্দলালের নিরুৎপাত দাম্পত্যজীবনে নিঃশব্দ আততায়ীরূপে রোহিণীর প্রবেশকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে অবপ্রাণী বিড়ালের আশ্রয়ে।—

> সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল। (ষোড়শ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

বলাই বাহুল্য এই লাঠি এবং বিড়াল যথাক্রমে ভ্রমরের দুর্ভাগ্য আর রোহিণী নামক অভিশাপের সংকেতিত চিহ্নায়ক। বারুণীর জলে রোহিণীর আত্মবিসর্জন প্রচেষ্টার সমান্তরালে সংঘটিত এই বিড়াল নিধনের ব্যর্থ চেষ্টার প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে এক সুদূর সঞ্চারী আভাস এবং আখ্যানের গতিধারার প্রচ্ছন্ন নিদের্শনা বহন করে চলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে বিড়াল ছাড়াও বাঘ, সিংহ, চিল, রাজহংস, পাখী প্রভৃতি অবপ্রাণীবাচক অনুষঙ্গও কখনো কখনো প্রতীকাভাসে সুবিন্যস্ত। এ-সকল প্রতীকী অনুষঙ্গ কোনো ঐক্যবদ্ধ ও সামগ্রিক কোনো চিহ্নায়নকে সংকেতিত করে না। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সংগঠন বিশ্লেষণ কিংবা আখ্যানধারার বিকাশের লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এরা ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার কেবল বিশিষ্ট উপন্যাস-প্রাণতাকে বহুস্বরে ধারণের উদ্দেশ্যেই ঘটেনি, একইসঙ্গে তা ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের প্রমুখন কৌশল হিসাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেহেতু প্রধানত ইতিহাস-আশ্রয়ী সেহেতু সুনিপুণ প্রমুখন প্রক্রিয়া ব্যতীত এই অতীতচারী শিল্পভঙ্গিকে কালোত্তীর্ণ করে তোলা সম্ভব নয়। তাই উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয়ে লেখক এই বাক্-ভঙ্গিগত বিশেষত্বকে পাঠকের সম্মুখে এগিয়ে দিয়েছে। বলা যেতে পারে, উপন্যাসসমূহের প্রমুখন-লব্ধ বাক্-চাতুর্যের কারণেই আখ্যানের অনেক অতিপ্রাকৃত কিংবা আকস্মিক ও কাকতালীয় অংশ পাঠকের সম্মুখে অনায়াসে যুক্তিস্রোতে প্রবাহিত হয়। একইসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের এ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উপস্থাপন কৌশল তার শিল্পকর্মকে প্রদান করে অসমান্তরাল বিচ্যুতি তথা স্বাতন্ত্র্য। এ-কারণেই উনিশ শতকের অপর সকল সাহিত্যিক অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান বিশেষত্ব নির্দেশিত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশেষ নন্দনচেতনা দেশকাল-সমাজের আবেশে আপন শিল্পাত্মার ক্রমবিকাশে কালপরম্পরায় অর্জিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

> বঙ্কিম ভারতবর্ষের জীবনকে, তার বহুকালাগত জীবনাচরণকে নবকালের ঘাত-প্রতিঘাত সমেত উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ও করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের সমস্যারম্ভের মূলে রয়েছে জীবনযাপনের মূলসূত্রগুলিতে কোন না কোন প্রকার ব্যত্যয়। বঙ্কিমের কালে এই বিষয়বস্তুর যে মূল্য ছিল, তার সীমার বাইরে এসেও যে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মের মূল্যহানি হয়নি, এর কারণ জীবনকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম দু হাতে ছুঁয়েছিলেন। মানুষের যন্ত্রণাকে, বাসনাকে, বাসনার অচরিতার্থতা-জনিত অশ্রুকে বঙ্কিম কখনো ছোট করে দেখেননি। বরং মানুষের জীবনযাপনে, কর্মে, ধ্যানে এদের প্রভাব কতখানি বস্তুত অপরিহার্য, সে-কথা বলেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে। জীবনই সত্য, এবং জীবনাতীত জীবনাতীতই থাকে, তা নিয়ে জীবনের কোনো সান্ত্বনা নেই— সচেতনভাবে বঙ্কিম এ-কথা বলেছিলেন। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১২৮:১৯৮৮)

কিন্তু, এই সচেতন প্রত্যয় সত্ত্বেও বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্রসমূহ পূর্বাপর অপ্রাপণীয়কে আয়ত্ত করবার অভিযানে আত্মসমর্পিত। বঙ্কিমের নীতিবোধ, উপযোগিতাবাদ, সামাজিক দায়বদ্ধতা— সকল সচেতন বোধে উজ্জীবিত হয়েও মানুষের প্রতি চূড়ান্ত মমতা তাঁকে মানব মনোনির্দেশিত পথেই শেষ পর্যন্ত চালিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই মানবিক পথ-পরিক্রময়ায় পূর্বাপর আলঙ্কারিক ভাষার আশ্রয়-প্রত্যাশী; যার উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক। বলা যেতে পারে, বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রমুখনের শৈল্পিক বৈচিত্র্য এবং শিল্পীর নিজের বিচ্যুতিবোধ সামগ্রিকভাবে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রয়োগকাঠামো এবং চিহ্নায়ন পরিক্রমাকে রসোত্তীর্ণ করতে বিশেষ নান্দনিক সহায়তা প্রদান করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসহ সকল রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি ভাষাকাঠামোর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ব্যবহার সুস্পষ্ট। বিশেষত তাঁর উপন্যাস যেন নিজস্ব শিল্পবিশ্বাসেরই শব্দরূপ। এ কারণে তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে আদর্শ ও লক্ষ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাদেরকেই তিনি শিল্পভাষায় সমীকৃত করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে, পাঠকের প্রতি পূর্বাপর অনুপুঙ্খ দায়বদ্ধতার কারণে তাঁর উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগতে সংঘটিত হয়েছে গুণগত বিবর্তন; নতুনতর

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প-প্রকৌশলে পাঠকের সাহিত্যিক সামর্থ্যকে পুনর্মূল্যায়িত করার সুযোগ প্রদানসূত্রে তাঁর উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে ধ্রুপদী রসসংবেদনা। রীতিগত বিশেষত্বে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তিনি তাঁর স্বোপার্জিত নীতি ও আদর্শের জগৎকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ কারণে নীতিমূলকতাকে স্বীকার করেও বঙ্কিম-উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এক শৈলী-সার্থক নান্দনিক শিল্প অবয়ব।

বঙ্কিম-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ভাষিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বভাবতই এতে ক্রিয়াপদের সাধুরূপের ব্যবহার পূর্বাপর বজায় রাখা হয়েছে; যৌগিক ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অধিক। পদবিন্যাসে ক্রিয়াবিশেষণের সুমিত প্রয়োগের প্রবণতা ব্যাপক। একইসঙ্গে, কথোপকথনে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব লক্ষ করা গেলেও উপমা-চিত্রকল্প কিংবা প্রতীক সংবলিত বাক্যে বা বাক্যসমূহে কোনো অ-মান্য ভাষার অনুসৃতি লক্ষ করা যায় না। শব্দ ব্যবহারে বিভিন্ন সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ সৃজনের সূত্রে ঔপন্যাসিক প্রায়শই ভাষিক স্বাতন্ত্র্য সংগঠনে আগ্রহী। আলোচ্য শিল্প-উপকরণ ত্রয়ের বাক্যিক গঠন প্রধানত জটিল এবং উদ্দেশ্য+বিধেয়+ক্রিয়ার মিশ্রিত প্রয়োগে সাধিত হয়। তবে, কখনো কখনো ছোট ছোট পদবন্ধের সরল ও সুমিত আকারের বাক্যনির্মিতি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকে সমান্তরলতা সঞ্চার করে। দীর্ঘ বাক্য গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও এতে সংযোজক অব্যয়ের উপস্থিতি স্বল্প। আবৃতধর্মী ক্রিয়াপদ বা বিশেষণ ব্যবহারের প্রবণতা তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এ সকল প্রবণতাকে নিচের দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ক. কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি— তা দূর হউক, ও আর ভাবি না— বড় কান্না পায়! দূর হউক— ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! (ষোড়শ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

খ. আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীশের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসার স্রোতে অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম? (প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

এছাড়াও, বিরামচিহ্নের সুচিহ্নিত ব্যবহার উপন্যাসের বাগর্থ অনুধাবনে পূর্বাপর সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক ভাষার সার্বিক মূল্যায়নে স্মরণীয়:

> বঙ্কিমের উপন্যাসে বিচিত্র মনোভাব, প্রবৃত্তিতরঙ্গ, রূপবর্ণনা, ঘটনাগতি সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ভাষার নানা ধরনের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কোথাও ভাষা চঞ্চল, দ্রুতগতি, কখনও মন্থর। কখনও বিপরীত লয়ের উত্থান-পতন। ছোট বড় নানা আকারের বাক্য তিনি মিশিয়েছেন, নানা জাতের শব্দে যোজ্যতা

Dhaka University Institutional Repository

> ঘটিয়েছেন। কখনও আবার প্রশ্নাত্মক নির্দেশক বিস্ময়বোধক বাক্য একে অপরের গায়ের উপরে পড়েছে, এবং অর্ধসমাপ্ত বাক্যের প্রয়োগেও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে চেয়েছেন।
>
> সংলাপের ভাষায় নাটকীয় তৎপরতা, স্থিরচিত্রে ভাষার কৌশলে গতিময়তা সৃষ্টি, সংক্ষিপ্ত কথার নিগূঢ় ব্যঞ্জনাধর্ম এবং বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততা ও বস্তুনিষ্ঠা লক্ষণীয়। আবার সে-ভাষা যখন অলঙ্কৃত যখন চিত্রময় তখন ঐশ্বর্য বর্ণাঢ্যতা প্রকাশই লক্ষ্য।
>
> এবং সব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা সংযত পৌরুষ এ-ভাষার প্রাণসত্য। (ক্ষেত্র গুপ্ত; ৮:১৯৮৭)

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষাগত বিশেষত্ব সকল ক্ষেত্রেই নিজস্বতাচিহ্নিত। সেইসঙ্গে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ভাষিক বিন্যাসেও তাঁর সচেতন সৃজনপ্রতিভা নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয়। বাংলা উপন্যাসের শিল্পভাষা সৃজনের যে স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব বঙ্কিচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তার সাফল্য ও পূর্ণতা মূলত এ সকল রচনায় যথার্থ আলঙ্কারিক ভাষার যোগ্যতম প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বলা যেতে পারে, 'বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মধ্যে পথ-নির্মাতা, পাথেয় আহরণকারী ও গন্তব্য নির্দেশকের বিরল সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন' (তপোধীর ভট্টাচার্য; ১১:১৯৯৯)। জীবনার্থ সন্ধানের বিশিষ্টতায় বঙ্কিমচন্দ্র বারবার আপন শিল্পবোধের সঙ্গে আচরিত মতবাদ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক তথা আলঙ্কারিক ভাষাসৃজনে তিনি ছিলেন পূর্বাপর নির্দ্বন্দ্ব, পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্পের নিকট আত্মসমর্পিত। বস্তুত, কবি-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজনের মধ্য দিয়েই সম্ভবত কাব্যলোককে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক শিল্পীর মানসধর্মের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে উপন্যাস সাহিত্যের নান্দনিক উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারসাম্য-বিঘ্নিত দেশকাল-সমাজ পটে বাংলা উপন্যাস নতুনতর বিন্যাসে হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যসন্ধানী, আধুনিক মানবের জটিল মনোজগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নিরন্তর উৎসাহী। বিগত শতকের সম্ভাবনার উত্তরাধিকারকে ধারণ করে এই কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার নিজেকে অতিক্রম করার শৈল্পিক দায়িত্বে অগ্রসর হন। উনিশ শতকের পরিশীলিত মূল্যবোধের আশ্রয়ে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার বিকাশ সূচিত হলেও বিশ শতকে এসে স্বোপার্জিত জীবনবীক্ষায় তিনি তাঁর উপন্যাসকে আধুনিক মানবের সংবেদনশীল ও বিবর্তমান অনুভবের সঞ্জননী অন্বেষণক্ষেত্রে পরিণত করেন। তাঁর উপন্যাসে ধারাবাহিকভাবে আবিষ্কৃত হয় মানবচেতনাতলস্থ জড় ও জঙ্গমের ঘূর্ণাবর্ত-শাসিত আপেক্ষিক ব্যক্তিস্বরূপ। শতকান্তরের বহুভুজ জটিলতায় ক্লীণ্ন বাস্তবের হাতে কাম্য বাস্তবতার নির্মম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও মানবাত্মার শুশ্রূষা-প্রদায়ী অত্যুচ্চ জীবনবোধ অন্বেষণের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ চিহ্নায়িত করেন দেশকাল-সমাজ বেষ্টিত মানুষের মনস্তত্ত্ব। বস্তুত, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই প্রথম মহাসামরিক পটভূমিতে বিশ্বের শিল্পরীতি এক অন্তহীন আত্মসংবেদের বিঘ্নসংকুল উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছিল। ফলে, শিল্প ও জীবনে দেখা দিয়েছিল সুস্পষ্ট বিভাজন; শিল্পীর কালিক অভিজ্ঞতাকে অপসৃয়মান সময় থেকে উদ্ধারের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নতুনতর আকরণ আবিষ্কার। যদিও এই সকল নিয়ত-অস্থির আকরণ কালের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত, কিন্তু সংকটাপন্ন ব্যক্তিময়তা, লুপ্ত পরম-এর শ্মশানভূমিতে বস্তু ও চেতনার স্থিতিশূন্য সম্পর্ক-পরিক্রমা প্রভৃতির দোলাচলে এরা বিপন্ন মানব-অস্তিত্বের শাশ্বত প্রবহমানতাকে ধারণ করে।[১] বিশ শতকে অত্যাসন্ন মহা-অন্ধকারের পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করলেও তাঁর শিল্পবিশ্বাস কখনো বিমানবিক হয়ে ওঠেনি। সারা বিশ্ব জুড়ে যন্ত্র ও পুঁজির কৃষ্ণগহ্বরে মানবজাতির আত্মাহুতির পরিণাম তাঁকে অশনি-শঙ্কিত করে তুলেছে বারবার; কিন্তু উপনিবেশিত ভারতের বহুবিস্তৃত সম্ভাবনাময় মধ্যশ্রেণীকে আশ্রয় করে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি চূড়ান্তভাবে সদর্থক বিশ্বজাগতিক মানবতাবোধকে লালন করে গেছেন। তাই সময়ের সাথে সকল কিছুকে নিজস্ব শিল্প-দক্ষতায় রূপান্তরিত করে নতুন শতকের 'চলতি হাওয়ায়' সদাসাম্প্রতিক করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ঔপন্যাসিক-অভিযাত্রাকে প্রদান করেছেন বিশিষ্ট নান্দনিক উচ্চতা।

---

[১] তথ্যসূত্র: বেগম আকতার কামাল; " শিল্পসাহিত্যে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত", ১৬-১৭ : ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

'অভিজ্ঞতায় ধৈর্যগম্ভীর, জীবনবোধে দর্শনাশ্রয়ী ও জীবনদৃষ্টিতে সংযমমার্জিত পরম সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক'[১] মানস অবয়ব নিয়ে আদ্যন্ত আলোড়িত ও বিবর্তিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে কবিসত্তার সঙ্গে নান্দনিক সৌকর্যে সমীকৃত করতে চেয়েছেন। অনন্যসুলভ কবিত্বশক্তিই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক শিল্প-স্বরের অনুরণন জাগিয়ে তুলেছে। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকার, অপরদিকে দুই শতকের সন্ধিক্ষণের প্রবণতাকে বৈশ্বিক দ্যোতনায় আত্মস্থ করে যে বিবিধ ও বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিভূমিকে শক্তিশালী করে তোলেন সে সফল শিল্প-গবেষণার অন্তর্স্রোতে আলঙ্কারিক ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকান্তিক নান্দনিকতায় স্বতঃসঞ্চারণশীল উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয়ে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের পাঠকৃতি ধারণ করে আখ্যান কিংবা চরিত্রসমষ্টির বহুস্বরিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের বিশেষ কোনো ভাববিশ্বে উত্তরণের শিল্প-সম্ভাবনা। ঔপন্যাসিক সত্তায় তিনি পূর্বাপর রূপান্তরধর্মী, আপন বোধের জগতে বহুমাত্রাসন্ধানী। তিনি স্বয়ংরূপান্তরিত হন নির্বস্তুক সত্তাভাবনা থেকে মানবীয় মূর্ততায়, পরম সৌন্দর্যানুভূতি থেকে দ্বন্দ্বজটিল বস্তুসমাজে। তাঁর রসরূপকল্পনা অবসিত হতে চায় সূক্ষ্মযুক্তিধর্মী বিশ্লেষণে; বিরূপ ও সংঘাতময় প্রতিবেশের অন্তর্চাপে হৃদয়ের একান্ত শুভচিন্তা ও শান্তিকামনার বিজয়কেতন উড়িয়ে দেওয়ার আনন্দে।

রবীন্দ্রচেতনার এই ব্যাপ্ত ও ব্যতিক্রমী সংগঠন উপন্যাসের পাঠকৃতিতে প্রধানত যথার্থ উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয়ে বিকশিত হয়েছে । এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস তাঁকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাণিত করেছে: প্রতিটি রচনাকে শিল্পসার্থকতায় অনেকান্ত করে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছে। উপন্যাসের পাঠকৃতি যেহেতু কেবল ব্যক্তিমনের দোলায় অনন্যপন্থী ভাবলোকচারী ভাষিক আকরণ সৃজন করে না, বরং বিশাল সমাজকাঠামোর অগণিত মানবমনের অনিঃশেষ মনস্তাত্ত্বিক সূত্রকে তাদের অভিজ্ঞতা ও বস্তুপরিপ্রেক্ষিতের সাপেক্ষে আন্দোলিত ও আলোকিত করে, সেহেতু এর শিল্প-উপকরণ বিস্তৃতি ও গভীরতায় স্বভাবতই বহুদেশদর্শী, বহুস্বরের সহাবস্থানে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজনে এই বিচিত্র-অভিজ্ঞ বহুমানুষের সমাজ-মনস্তত্ত্ব নানামাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ যেন উপন্যাসের আঙ্গিকে এ সকল শিল্প-উপকরণের আশ্রয়ে তাঁর অন্তর-পরিব্যাপ্ত কাব্যরস পিপাসাকে নবীন মাত্রায় উপভোগ করতে চেয়েছেন। কাব্যানুভূতি-সঞ্জাত উপন্যাস সৃজনের সর্বোৎকৃষ্ট নির্দশন নিঃসন্দেহে *শেষের কবিতা*; কিন্তু এই প্রণোদনার বীজমন্ত্র তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই নানা ভঙ্গিমায় উচ্চারিত। *বউঠাকুরানীর হাট* কিংবা *রাজর্ষি* উপন্যাসে পুর্নগঠিত রোমান্সের[২] পরিবেশে সৃজনে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে আশ্রয় করেছেন উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক, তেমনি *চোখের বালিসহ* উত্তরকালে রচিত সকল উপন্যাসেও এ প্রবণতা অব্যাহত থেকেছে। এমনকী, বিভিন্ন উপন্যাসের আখ্যান ও চরিত্রের বিন্যাস ও সংগঠনে এদের প্রয়োগ হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। রাবীন্দ্রিক দর্শন ও বিশ্বাসকে অনেকান্তিক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করে তুলবার প্রধানতম উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এ সকল উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক। রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশে এদেরকে

---

[১] সৈয়দ আকরম হোসেন; ১৪৯ : ১৯৮৮

[২] রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকীয় উপন্যাসদ্বয়ে রোমান্সের কাঠামো ব্যবহৃত হলেও তা নান্দনিক ব্যঞ্জনায় বঙ্কিম-উপন্যাসের রোমান্স-প্রতিবেশ থেকে ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারকে বহন করেও নিজস্ব সৃষ্টিশীলতায় তিনি রোমান্সের জগৎকে চিরায়ত বোধ ও চেতনায় পুনর্গঠিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে, উপন্যাসসমূহের শৈলী অনুধাবনে এ সকল উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। রবীন্দ্র উপন্যাসের শিল্প-উপকরণের এই নির্বাচিত জগতের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হবে চিহ্নবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ। নিচে, নির্বাচিত তালিকা নির্দেশসহ রবীন্দ্র উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপমা-চিত্রকল্প

রবীন্দ্র উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প বিশ্লেষণের লক্ষ্যে উপমা ও চিত্রকল্পের জন্য নিচে ভিন্ন দুটি উপ-তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উপন্যাসের রচনাকাল অনুসারে সজ্জিত এ দুটি উপ-তালিকায় মূলত স্থান পেয়েছে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের মূল পাঠকৃতির প্রতিনিধিত্বশীল, আখ্যান কিংবা চরিত্রের বিশেষত্ব নির্দেশক উপমা এবং চিত্রকল্প। এই সকল নির্বাচিত শিল্প-উপকরণকে চিহ্নায়িত করে এদের নান্দনিক ও শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নতুনমাত্রায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

উপমা

১. এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

২. জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৩. আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে, তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চিৎকার করিয়া কহিল, "কিছুই হইল না, কিছুই না! এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোমাদের হইবে।" (ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৪. সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দিরসংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল তখন চারিদিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মতো তাহার ফুটফুটে মুখখানি হইতে যেন একটা বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। (প্রথম পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৫. সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছায়াটির মতো চলিয়া যাইত। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

Dhaka University Institutional Repository

৬. 'হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না।...' (দশম পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৭. অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মতো নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। (ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৮. কয়দিন মাতৃ-স্নেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তন্যভারাতুর স্তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। (পরিচ্ছেদ ৪, *চোখের বালি*)

৯. আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ৬, *চোখের বালি*)

১০. বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ৭, *চোখের বালি*)

১১. জাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহার প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ১০, *চোখের বালি*)

১২. ক্ষুধিত হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ১১, *চোখের বালি*)

১৩. একদিন মহেন্দ্র যে এসেন্স আশাকে উপহার দিয়াছিল সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। (পরিচ্ছেদ ২০, *চোখের বালি*)

১৪. ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল। (পরিচ্ছেদ ২৪, *চোখের বালি*)

১৫. বিনোদিনীর কথা বিহারীর কানে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ— সে যেন স্বপ্নচালিতের মতো মহেন্দ্রের ঘরের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২৮, *চোখের বালি*)

১৬. সূর্যালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, সে-সকল স্মৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীব্র উজ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিগ্ধছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৩২, *চোখের বালি*)

১৭. কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, দুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। (পরিচ্ছেদ ৩৫, *চোখের বালি*)

১৮. ঈগল যেমন মেঘসাবককে এক নিমিষে ছোঁ মারিয়া তাহার সুদুর্গম অভ্রভেদ পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিখিলবিস্তৃত স্থান নাই যেখানে একাকী মহেন্দ্র তার এই কোমল সুন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। (পরিচ্ছেদ ৪৫, *চোখের বালি*)

Dhaka University Institutional Repository

১৯. পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো উর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৩, *নৌকাডুবি*)

২০. অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকঝিক করিতেছে। (পরিচ্ছেদ ৩, *নৌকাডুবি*)

২১. একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনি এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ৭, *নৌকাডুবি*)

২২. তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার ছুটির কলকাতা জোয়ারের নদীর মতো তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চলমুখর হইয়া উঠিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ১৪, *নৌকাডুবি*)

২৩. চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতরে গঙ্গাযমুনার মতো সাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। (পরিচ্ছেদ ১৬, *নৌকাডুবি*)

২৪. সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিল। (পরিচ্ছেদ ২২, *নৌকাডুবি*)

২৫. আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মতো উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২৯, *নৌকাডুবি*)

২৬. অবশেষে গাড়ি কাশী স্টেশন ছাড়িল, মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া রেলগাড়ি গর্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ৫৪, *নৌকাডুবি*)

২৭. দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। (পরিচ্ছেদ ২, *গোরা*)

২৮. ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার-বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—... (পরিচ্ছেদ ২, *গোরা*)

২৯. জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্র পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি। (পরিচ্ছেদ ৪, *গোরা*)

৩০. ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল, রাত্রির মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মতো নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৭, *গোরা*)

৩১. সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। (পরিচ্ছেদ ১০, *গোরা*)

Dhaka University Institutional Repository

৩২. সাপ যেমন কাহাকেও গিলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িতে পারে না— গোরা তেমনি তাহার কোনো সংকল্প ছাড়িয়া দিতে বা তাহার একটু-আধটু বাদ দিতে একবারে অক্ষম বলিলেই হয়। (পরিচ্ছেদ ১৯, *গোরা*)

৩৩. চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া রাখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২০, *গোরা*)

৩৪. তাহার সম্মুখে যেন একটা কোন্ অপরিচিত অপূর্ব দেশ মরীচিকার মতো দেখা দিয়াছিল; জীবনের এতদিনকার সমস্ত জানাশুনার সঙ্গে সেই দেশের একটা কোথাও একান্ত বিচ্ছেদ আছে; (পরিচ্ছেদ ২২, *গোরা*)

৩৫. এই হর্ম্যসংকুল শহরের জনাকীর্ণ রাজপথে বিনয় সর্বত্রই নিজের জীবনের একটা ছায়াময় পাণ্ডুবর্ণ সর্বনাশের চেহারা দেখিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ৪৫, *গোরা*)

৩৬. ...কিন্তু সকালবেলার আলোকের ভিতর দিয়া একটা মদিরতা তাহার মনে সঞ্চারিত হইল; রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল, তাহার সেই হাঁকের সুরও তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর চাঞ্চল্য জাগাইল। বাহিরের লোকনিন্দাই যেন ললিতাকে বন্যার মতো ভাসাইয়া বিনয়ের হৃদয়ের ডাঙার উপর তুলিয়া দিয়া গেল... (পরিচ্ছেদ ৪৯, *গোরা*)

৩৭. কিন্তু খাঁচার দ্বার খোলা পাইলে পাখি যেমন ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া যায় তেমন করিয়া তাহার মন তো নিষ্কৃতির অবধারিত পথে দৌড় দিল না। (পরিচ্ছেদ ৫২, *গোরা*)

৩৮. ঘটনাগুলোও শিকারী বাঘের মতো প্রথমটা গুড়ি মেরে মেরে নিঃশব্দে চলে, তার পরে হঠাৎ এক সময় ঘাড়ের উপরে লাফ দিয়ে এস পড়ে; আবার তার সংবাদও আগুনের মতো প্রথমটা চাপা থাকে, তার পরে হঠাৎ দাউ দাউ করে যখন জ্বলে ওঠে তখন তাকে আর সামলানো যায় না। (পরিচ্ছেদ ৫৩, *গোরা*)

৩৯. "কালের গতি হচ্ছে জলের ঢেউয়ের মতো, তাতে ডাঙাকে ভাঙতে থাকে; কিন্তু সেই ভাঙনকে স্বীকার করে নেওয়াই যে ডাঙার কর্তব্য আমি তা মনে করি নে। (পরিচ্ছেদ ৬২, *গোরা*)

৪০. এক মুহূর্তে গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ৭৫, *গোরা*)

৪১. শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। (জ্যাঠামশাই ১, *চতুরঙ্গ*)

৪২. ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক সুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। (জ্যাঠামশাই ৫, চতুরঙ্গ)

৪৩. এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিভিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না। (শচীশ ২, *চতুরঙ্গ*)

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্, আমার তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা— বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না— আমি যে আমি। (শচীশ ৪, *চতুরঙ্গ*)

৪৫. শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে : যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো— এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। (দামিনী ৪, *চতুরঙ্গ*)

৪৬. আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতার শিশিরের ফোঁটা নয়। (শ্রীবিলাস ১, *চতুরঙ্গ*)

৪৭. দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। (শ্রীবিলাস ২, *চতুরঙ্গ*)

৪৮. আমি বললাম, "মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতা, যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়। (শ্রীবিলাস ৫, *চতুরঙ্গ*)

৪৯. মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলা নিতুম তখন মনে হত, আমার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫০. আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল— সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫১. সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম, কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫২. নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাই নি— আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণির মতো ঘুরছিল। (বিমলার আত্মকথা, ঘরে-বাইরে)

৫৩. আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত-রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা — তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে। অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে— সে যেন দামী হীরের ঝলকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি, সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫৪. এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারত-মহাসাগরের কোন্-এক দ্বীপের অনেক দামী এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই-কটি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুর করে ঢেলে দেওয়া; ইন্দ্রধনু যেন ঐ-কটি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. দেখছি, বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্‌ করছে। তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয়, কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। (সন্দীপের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫৬. ফোটোগ্রাফের প্লেটে যেরকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। (নিখিলেশের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫৭. চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায়না। (সন্দীপের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫৮. আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৫৯. আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে, যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৬০. বিমলকে ডেকে পাঠালুম। তিনি একখানি সাদা শাল মাথার উপরে দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন; পায়ে জুতোও ছিল না; দেখে আমার মনে হল, বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখিনি— সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে। (নিখিলেশের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৬১. গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো। (পরিচ্ছেদ ১, *যোগাযোগ*)

৬২. ঘা-খাওয়া বংশ ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড় ভয়ংকর। (পরিচ্ছেদ ২, *যোগাযোগ*)

৬৩. মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসংকোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। (পরিচ্ছেদ ৬, *যোগাযোগ*)

৬৪. সামনে ইটের কলেবরওয়ালা কলকাতা, আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। (পরিচ্ছেদ ১১, *যোগাযোগ*)

৬৫. মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহাড়া দিচ্ছে। (পরিচ্ছেদ ১৭, *যোগাযোগ*)

৬৬. জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসর বর্ণ। (পরিচ্ছেদ ১৭, *যোগাযোগ*)

৬৭. চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর-এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। (পরিচ্ছেদ ১৯, *যোগাযোগ*)

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. নতুন মহারানীর উপযুক্ত শয়নঘর কী রকম হওয়া বিধিসংগত এ কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। এমন হয়ে উঠল, যেন অন্দরমহলের সর্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা-কাঁথা-গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরিজহরাত-দেওয়া পাগড়ি। (পরিচ্ছেদ ২২, *যোগাযোগ*)

৬৯. এই ভালোবাসার পূর্ব ভূমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটা বিষাদের নম্রতা। (পরিচ্ছেদ ২৩, *যোগাযোগ*)

৭০. আকাশে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। (পরিচ্ছেদ ২৪, *যোগাযোগ*)

৭১. আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশেষিত হয়ে উঠবে। (পরিচ্ছেদ ২৮, *যোগাযোগ*)

৭২. পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। (পরিচ্ছেদ ৩৪, *যোগাযোগ*)

৭৩. যে ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেছে চাল জোটে নি, তারই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে গিয়েছিল। (পরিচ্ছেদ ৩৯, *যোগাযোগ*)

৭৪. শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যাবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেইরকম মনের অবস্থা। (পরিচ্ছেদ ৪৫, *যোগাযোগ*)

৭৫. কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে আগুন জ্বলছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়— সে তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই। (পরিচ্ছেদ ৫০, *যোগাযোগ*)

৭৬. আসলে যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারী, বর্ধমানের ওয়েটিং-রুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাস-দখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা। (পরিচ্ছেদ ১, *শেষের কবিতা*)

৭৭. ... কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা— ধরা দিয়েই আছে, তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। (পরিচ্ছেদ ১, *শেষের কবিতা*)

৭৮. অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পুর্ণিমারাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। (পরিচ্ছেদ ৫, *শেষের কবিতা*)

৭৯. 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখির মতো, কতদিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে— সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন। (পরিচ্ছেদ ৯, *শেষের কবিতা*)

৮০. সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে; বাদলের পরদিনকাল সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো; (পরিচ্ছেদ ১০, *শেষের কবিতা*)

Dhaka University Institutional Repository

৮১. যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলি হত অনাবাদি ফসলের মতো। (শর্মিলা, *দুইবোন*)

৮২. "তুমি প্রজাপতির মতো, চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মৌমাছির মতো।" (নীরদ, *দুইবোন*)

৮৩. বালশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।... নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্রপ্রয়োজনের অযোগ্য। (পরিচ্ছেদ ১, *মালঞ্চ*)

৮৪. ও যে ভালোবাসার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে! মনে তো আছে, একদিন সরলার মুখে হাসি-খুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। (পরিচ্ছেদ ৪, *মালঞ্চ*)

৮৫. অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী!" (দ্বিতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

৮৬. হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। (তৃতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

৮৭. "ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। (তৃতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

৮৮. ... মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নতুন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়; দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশ-পরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। (তৃতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

চিত্রকল্প

১. আমার হৃদয়-পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল। (প্রথম পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

২. ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি কারয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৩. রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলি হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৪. শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল, প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল, চারি দিকে নদী কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল, কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। (অষ্টম পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

Dhaka University Institutional Repository

৫. এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে— কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চিৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছমছম্ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলাস্থ অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। (দশম পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৬. ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল। (একাদশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৭. অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৮. অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষুতারকায় অঙ্কিত হইল। (ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৯. ... চতুর্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল, তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল; একটা-কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয়বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই-সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরের দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখির মতো তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। (চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

১০. প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ঝরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২৪, *চোখের বালি*)

১১. বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল— বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ২৮, *চোখের বালি*)

১২. রাত্রির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের ন্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৪০, *চোখের বালি*)

১৩. নীরবতা যেন দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল না, এমন সময় আশা সহসা কেল্লার একটি ছোট দ্বার খুলিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ৪৩, *চোখের বালি*)

১৪. সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ-হাওয়া বহিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ৫, *নৌকাডুবি*)

১৫. শরতের এই ম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দ-ভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটি বন্ধ কারয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ১৪, *নৌকাডুবি*)

১৬. এ দিকে রমেশের বুকের ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মতো যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। (পরিচ্ছেদ ১৯, *নৌকাডুবি*)

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধারের ওপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। (পরিচ্ছেদ ২৭, *নৌকাডুবি*)

১৮. কমলা বিছানা ছাড়িয়া কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চিৎকার করিয়া দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। (পরিচ্ছেদ ২৯, *নৌকাডুবি*)

১৯. আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্রমাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাতলা সাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের ঘোরের মতো মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপসা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে। চারি দিকে দিগন্ত পর্যন্ত নানা আয়তনের উঁচুনিচু ছাতের শ্রেণী ছায়াতে আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের মতো পড়িয়া রহিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ১৫, *গোরা*)

২০. তাহার মনে হইতে লাগিল, গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং; সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে— (পরিচ্ছেদ ২৩, *গোরা*)

২১. আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২১, *গোরা*)

২২. ঈশ্বর তোমাকে কি পাখা দিয়েছেন। তোমার কোনো জায়গায় কিছু ঠেকে না? (পরিচ্ছেদ ৫০, *গোরা*)

২৩. দামিনী যেন শ্রাবণ মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। (শচীশ ৬, *চতুরঙ্গ*)

২৪. একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেল বনের পল্লবীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। (শচীশ ৯, *চতুরঙ্গ*)

২৫. শচীশের একি চেহারা! প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা। (দামিনী ৪, *চতুরঙ্গ*)

২৬. সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিণ হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিলমিল করিয়া ওঠে। (দামিনী ৬, *চতুরঙ্গ*)

২৭. চারি দিক ধূধু করিতেছে; জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলোও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। (শ্রীবিলাস ২, *চতুরঙ্গ*)

২৮. কলকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল। (শ্রীবিলাস ৫, *চতুরঙ্গ*)

২৯. সকালে জেগে উঠেই দেখি, দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে— কী? এ কী? কী হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল? (নিখিলেশের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

Dhaka University Institutional Repository

৩০. মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে, যেন প্রাণের ফোয়ারর ধারা— সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। (সন্দীপের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩১. এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করছি এমন সময় আমার জানালার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল— আর তারই মধ্য থেকে একটা বড়ো তারা জ্বলজ্বল করে উঠল। (নিখিলেশের আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩২. এই নির্লজ্জকে, এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর বের করে দেখিয়ে দিলে। কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩৩. অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো; তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল, আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্য। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩৪. এক রকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি— প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, ভোরের জগতের ওপারে। (পরিচ্ছেদ ২০, *যোগাযোগ*)

৩৫. কলকাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারর আলো যেন ভাঙা-গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। (পরিচ্ছেদ ২৫, *যোগাযোগ*)

৩৬. আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই। (পরিচ্ছেদ ৪২, *যোগাযোগ*)

৩৭. বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে থাকলে মনটা দুর্বল থাকে।... বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনো গরম জমে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক-একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই ঘেমে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। (পরিচ্ছেদ ৫৭, *যোগাযোগ*)

৩৮. তাই ও যখন ভাবছে 'পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি' এমন সময়ে আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। (পরিচ্ছেদ ২, *শেষের কবিতা*)

৩৯. আকাশে সোনার রঙের উপর চুনিগলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিল। (পরিচ্ছেদ ১২, *শেষের কবিতা*)

৪০. সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরাশি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে। (পরিচ্ছেদ ১৬, *শেষের কবিতা*)

Dhaka University Institutional Repository

৪১. কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দীঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে। (পরিচ্ছেদ ১৭, *শেষের কবিতা*)

৪২. উর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিতে আঁকড়ে আছে কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। (উর্মিমালা, *দুইবোন*)

৪৩. আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন উর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। (উর্মিমালা, *দুইবোন*)

৪৪. নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। (পরিচ্ছেদ ১, *মালঞ্চ*)

৪৫. ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। (পরিচ্ছেদ ৪, *মালঞ্চ*)

৪৬. দিঘির ওপারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচা সোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে গন্ধের কুয়াশা যেন। (পরিচ্ছেদ ৫, *মালঞ্চ*)

৪৭. আমি যেন সমুদ্র ছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ এক দণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর। (পরিচ্ছেদ ৬, *মালঞ্চ*)

৪৮. "সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে না পৌঁছতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে।" (দ্বিতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

৪৯. "কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। (চতুর্থ অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উপমা-জগৎ বহুবিস্তৃত, প্রায়শই একাধিক শিল্প-মাত্রায় সংদ্যোতিত। আখ্যান কিংবা চরিত্রের মূলীভূত ব্যঞ্জনা-সম্ভারকে ভাষাকাঠামোয় অনুরণিত করা তাঁর উপন্যাসের সামান্য প্রবণতা; যা প্রায়শই চূড়ান্তভাবে স্পর্শ করে এক অন্তর্লীন চিত্রকাল্পিক আবহ। উপমান-শ্রেণীর প্যারাডাইম নির্বাচনে এবং তাদের সিন্‌ট্যাগম্যাটিক সজ্জায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করেন ইন্দ্রিয়াতীত আবেদনসম্পন্ন বিমূর্ত রূপকল্প যা, ব্যঞ্জনার্থে সংশ্লিষ্ট উপমাকে প্রদান করে বিশিষ্ট রসোত্তীর্ণতা। ফলে, রবীন্দ্র উপন্যাসে উপমা এবং চিত্রকল্পের শৈল্পিক ব্যবধান প্রায় ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম; এক সুগভীর নান্দনিক-ঐক্যে তাদের পরস্পর-সম্পর্কিত সহাবস্থান পাঠকৃতিতে চিহ্নিত। একইসঙ্গে, উপমা-চিত্রকল্পের চিহ্নায়ন প্রধানত উপন্যাসের আখ্যানসমগ্রের শৈল্পিক গঠন, উপযুক্ত প্রতিবেশ সৃজনের নান্দনিক আগ্রহ, শিল্প-সূক্ষ্ম চরিত্রায়ণ পদ্ধতি এবং বহুস্তরিক চরিত্রসমূহের বিন্যাস ও বিকাশের সূত্রে রসময় ও নান্দনিক হয়ে ওঠে। দেশকাল-সমাজ প্রভাবিত যে সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ রবীন্দ্র-মননের

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণক্ষেত্র, তারই অন্তর্বাহী সংহিতাপুঞ্জ থেকে তিনি আহরণ করেন অনিবার্য প্যারাডাইম; আর এরই আশ্রয়ে গড়ে তোলেন তাঁর উপমা কিংবা চিত্রকল্পের শিল্পসৌধ।

[ক] বউঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি

নিষ্ঠুর সামন্তশৃঙ্খলের অচলায়তন ভেঙে মানবিক চেতনা ও বিশ্বাসে স্থিত হওয়ার মৌল আবেদন *বউঠাকুরানীর হাট* ও *রাজর্ষি* উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। উনিশ শতকে রচিত এই উপন্যাসদ্বয়ের আখ্যান-সৃজন এবং চরিত্র-বিন্যাস হয়তো শৈল্পিক আবেদনে নিশ্ছিদ্র নয়। তা সত্ত্বেও রচনাদ্বয়ের উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পূর্বাপর সচেষ্ট থেকেছেন। এই লক্ষ্যে রোমান্সের পটভূমিতে নির্মিত উভয় উপন্যাসের চরিত্র-মনস্তত্ত্ব বিকশিত করবার প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন নানাবিধ উপমা ও চিত্রকল্প। *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিমানবিক অচলায়তনের বিপ্রতীপে পুত্র উদয়াদিত্য, পুত্রবধূ সুরমা, কন্যা বিভা এবং তাদের পিতৃব্য বসন্ত রায় যে উদার মানবিক মনোভঙ্গি লালন করেছে তার বিশেষত্ব নির্দেশ; সেইসঙ্গে উদয়াদিত্যের অনিঃশেষ জীবন ও মর্যাদার সংকট, বিভা-উদয়াদিত্যের অন্তহীন যন্ত্রণাবোধ ও পরাভবচেতনা, সুরমা-বসন্ত রায়ের মৃত্যুময় ট্রাজিক পরিণতি— এ সকল কিছুরই নান্দনিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন উপমা ও চিত্রকল্পে। রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপমা উপ-তালিকার ১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পতিপ্রেম বঞ্চিতা বিভার নৈঃসঙ্গ্যকে চিহ্নায়িত করবার প্রয়োজনে শীর্ণ ছায়ার উপমান ব্যবহার করা হয়েছে। ছায়া যেমন বস্তুর অবিচ্ছেদ্য অথচ অবগুণ্ঠিতপ্রায় অংশ, বিভার একাকিত্বও তেমনি প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুর গৃহকারাগারে অমূল্যায়িত, অবজ্ঞার আন্তর্চাপে বেদনার্দ্র। অপরদিকে আলো-অন্ধকারের খেলা যেভাবে ছায়ার জন্ম দেয়, বিভার জীবনপ্রবাহও তেমনি আশা-নিরাশার দোলাচলে আন্দোলিত হয়েছে সমগ্র পাঠকৃতিতে। তাই বিভা মনোবেদনার গাঢ়তায় অ-শরীরী ছায়ার মধ্যেই আপন বস্তু-অস্তিত্বের বিনাশকে প্রত্যক্ষ করেছে। উপন্যাসের একাধিক প্রসঙ্গে বিভার এ ছায়াময় অস্পষ্ট ও সংকটময় অস্তিত্বকে চিহ্নায়নসূত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সম্পূরক দৃষ্টান্ত:

ক. সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

খ. *ম্লানশীর্ণ একখানি ছায়ার মতো* সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

সমগ্র উপন্যাস জুড়েই বিভার এই কারুণ্যসঞ্চারী অবয়ব বিভিন্ন চিত্রকল্পাত্মক উপমায় পরিবেশিত হয়েছে। বিভার যন্ত্রণাবোধের ভিন্নধর্মী সম্প্রসারণ ঘটেছে উদয়াদিত্যের মানবিক গুণাবলিঋদ্ধ অতি সংবেদনশীল চরিত্রের মনস্তত্ত্বে। পিতার মানবতাবিবর্জিত বজ্রকঠিন প্রাসাদে অবরুদ্ধ উদয়াদিত্যের মনোমুক্তির আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে পূর্বাপর শিল্পিত ভাষাকাঠোমোয় উপস্থাপিত হয়েছে। এরই স্বাক্ষর উপমা উপ-তালিকার ২ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। পাখির চিহ্নায়ক ব্যবহার করে উপমাটিতে উদয়াদিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

শিকলভাঙা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশের যে প্রচল কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে অসাধারণত্ব প্রদান করেছে সাঁতারের ক্রিয়াবাচকতা। 'অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার' দেয়ার মানসতার মধ্যে যে চিত্রকল্পাত্মক আবেগ সংগুপ্ত, তা একদিকে যেমন উদয়াদিত্যের বাধাবিহীন প্রাণকে চিহ্নায়িত করেছে, অপরদিকে উপন্যাসের মূল ভাববিশ্ব— মানবিক চৈতন্যের মুক্তির সুরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। অসূয়াপ্রবণ নারীচরিত্র রুক্মিণীর অপূর্ণাঙ্গ চরিত্রবিন্যাস পরোক্ষভাবে উদয়াদিত্যের মানবিক দায়বদ্ধতাকে চিহ্নায়িত করলেও রুক্মিণীর মনোবিশ্ব উন্মোচনে কখনো-কখনো যে জীবনপিপাসার আবেগময় প্যারাডাইম ব্যবহার করা হয়েছে, তার সপ্রমাণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায় উপমা উপ-তালিকার ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে সাপ, ক্রুদ্ধ বাঘিনী প্রভৃতি ভয়াবহ উপমান অনুষঙ্গে বিশেষায়িত রুক্মিনী এখানে চিহ্নায়িত হয়েছে আত্মঘাতী বৃশ্চিকের আশ্রয়ে। যদিও রুক্মিনী চরিত্রটি তার মানুষিক প্রবৃত্তিজাত ঈর্ষাক্রোধ আর প্রতিহিংসাকে কোনো ধারাবাহিক বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসে পরিবেশন করতে পারেনি, তবুও এক অস্পষ্ট জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং নীতিনিরপেক্ষ কামনাবহ্নি যেন চরিত্রটিকে করে তুলেছে বাস্তবসংলগ্ন। ভিন্ন দৃষ্টিকোণে বলা যায় যে, উদয়াদিত্যের গ্লানিদগ্ধ আত্মজিজ্ঞাসা সৃজনের উপায়রূপেও এই চরিত্রটি বিশেষ চিহ্নায়ন-সম্ভাবনাকে দ্যোতিত করেছে।

উপন্যাসে উদয়াদিত্যের এ সর্বতোমুখী সুকুমার মনোবৃত্তিকে উপস্থাপনের সহায়ক প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত উদয়াদিত্য ক্ষণকালের জৈবিক দুর্বলতায় রুক্মিণীর প্রতি আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় যে সীমাহীন অনুতাপে আচ্ছন্ন হয়েছে তাকেই চিহ্নায়িত করতে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পটি। সমগ্র উপন্যাসেই কালী, রাত্রী প্রভৃতি অন্ধকারের অনুষঙ্গ যেরূপ কলুষিত দুঃসময়কে সংকেতিত করেছে, সেইরূপ আবেদনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মালতী কিংবা জুঁই ফুলের শুভ্রতায় চিহ্নায়িত উদয়াদিত্য চরিত্রের সকল শুভপ্রবণতাকে অমানবিকতার কালিমায় ঢেকে দেওয়ার চিত্রকল্পে। অন্যাসক্ত অলঙ্কারের প্রয়োগে আপন কৃতকর্মে সন্তাপ-বিমূঢ় উদয়াদিত্য নিজেকে স্ত্রী সরমার নিকট সমর্পণের মধ্য দিয়ে যেন তার হৃদয়-পুষ্পবনের কলুষিত মালতী-জুঁইকে পুনরায় প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছে। আত্মার আলোকসন্ধানী উদয়াদিত্যের মতো তার বোন বিভাও বারংবার মসীলিপ্ত নিয়তিকে কোনো এক সুদূর-আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যক্ষ করেছে। চিত্রকল্প উপ-তালিকার ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে অন্ধকার আর ঝাউগাছশ্রেণীর অভেদ কল্পনায় কিংবা ৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বাতাসের শব্দে শিশুর কান্নার প্রতিধ্বনি যেন বিভার অনেকান্তিক দাম্পত্যসংকট ও মাতৃত্বের অচরিতার্থতাকেই ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করে। তাই এক বেদনা-উৎকেন্দ্রিক হৃদয় নিয়ে বয়ে-চলা বিভা উপন্যাসের আদ্যন্ত গভীর থেকে গভীরতর সংকটে নিপতিত ও পরিণতিতে স্বামী-পরিত্যক্ত বাণপ্রস্থ-জীবনে অবসিত। উদয়াদিত্য কিংবা বিভার সুগভীর মানবিকচেতনা আর সংসারবিচ্ছিন্ন বেদনাবহ পরিণাম উপন্যাসের বিবিধ চিত্রকল্পে নান্দনিক মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে।

বন্ধুর জীবনপথে মানবধর্মের বিজয়গাথাকে সমুন্নত রাখবার প্রতিশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস *রাজর্ষি*তেও সমভাবে পরিলক্ষিত। ধর্মের নামে প্রাণবধের বিরোধিতাসূত্রে শাসক ও যাজকের যে চিরায়ত সংঘাত এই উপন্যাসে রূপায়িত, সে সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের শিল্পবিবেচনা নিহিত আছে রাজা

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দমাণিক্যের মানবধর্মের প্রতি অবিচল আস্থায়। যদিও উপন্যাসের পরিণতি বাস্তব-অতিরেক বিপুল তত্ত্বভারে আক্রান্ত, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর অন্বিষ্ট দার্শনিকতাকে ভাষিক অবয়ব প্রদানের লক্ষ্যে যে সুগঠিত অধিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন তা এর শিল্প-অভিমুখকে নান্দনিক করে তুলেছে। একাধিক অপাপবিদ্ধ বালক-বালিকার উচ্চারণ ও অনুভব এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মানবীয় আবেগের প্রতিনিধি। এ কারণেই উপমা উপ-তালিকার ৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ক্ষণজীবী শিশুচরিত্র হাসির নিষ্কলুষ মুখশ্রীকে নির্মল প্রভাত আর বেল ফুলের শুভ্রতার যুগ্ম অনুষঙ্গে উপমিত হয়েছে। বস্তুত, হাসির এই সজীব সৌন্দর্যের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের অহিংস মানবদর্শন চিহ্নায়িত, অপত্য-প্রতিম হাসির অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যা ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে এক অবিচল নির্দ্বন্দ্ব আদর্শের দিকে। পশুবলির বীভৎসতায় মুহ্যমান হাসির মৃত্যুতে রাজা একদিকে যেমন সন্তান হারানোর মতো বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন, অপরদিকে এই ঘটনার সূত্রেই রাজার কাছে উন্মোচিত হয়েছে বলিপ্রথার নির্মমতা ও ভয়াবহতা। ধ্রুবকে আঁকড়ে ধরে শিশুর শুদ্ধ মানবিক চেতনাকে তিনি আপন অনুভবে একীভূত করতে চেয়েছেন। তাই হাসি যেন ধ্রুবর ছায়াসঙ্গি হয়ে চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করেছে গোবিন্দমাণিক্যের চেতনায়। ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ধ্রুবর আশ্রয়ে শোকাচ্ছন্ন গোবিন্দমাণিক্যের এই আকুল অনুভবই প্রকাশিত। রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়ায় ভ্রাতৃবিরোধের যে শঙ্কা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে ক্রমবিস্তার লাভ করেছে, তারই চিহ্নায়ন সংঘটিত হয়েছে ৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সাপের প্যারাডাইম ব্যবহার করে হিংসার বিসর্পিল ভয়াবহতাকে অভিপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাইয়ের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ যেমন প্রকাশিত, তেমনি এতে এক বিদ্বেষবিহীন ঔদার্যও যেন আভাসিত হয়ে ওঠে। উপ-তালিকার ৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিধৃত হয়েছে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের অদৃষ্ট-সমর্পিত অনুভব। সমগ্র উপন্যাসের পাঠকৃতিতেই তিনি নিয়তি-অতিক্রমী না হয়েও এক শাশ্বত মানবজীবনার্থ অন্বেষণে সক্রিয় থেকেছেন। তাই প্রজাশাসন ও সামন্ত ক্ষমতাবিস্তারের সংকীর্ণ বস্তু-তাড়না থেকে আত্মমুক্ত হয়ে সংসার বিচ্ছিন্ন প্রতিবেশে সন্তান-প্রতিম ধ্রুব আর তার মতোই আরো বালকের মধ্যে জীবনের প্রকৃত প্রশান্তি অন্বেষণ করেছেন। গোবিন্দমাণিক্যের এ আত্মসমাহিত দার্শনিকবোধ এবং তার মহিমান্বিত পরিণতিই আলোচ্য দৃষ্টান্তে অধিভাষিক ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়ে উঠেছে।

চিত্রকল্প উপ-তালিকার অন্তর্গত ৪ থেকে ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্ত *রাজর্ষি* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্য ও প্রবণতাকে চিত্রকাল্পিক আবহে শিল্পময় করে তুলবার স্মারকরূপে বিবেচিত হতে পারে। বিশেষত ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে রহস্যময় নিসর্গের অন্যাসক্ত আচরণের সিনট্যাগম্যাটিক বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সংকটাপন্ন ভ্রাতৃসম্পর্কের এক দ্বন্দ্বময় চিত্রকল্প অঙ্কনে প্রাণিত হয়েছেন। দৃষ্টান্তটিতে ব্যবহৃত মেঘাবৃত আকাশের সূত্রে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার মতো আবহ সৃষ্টি, যূথবদ্ধ কাকের অরণ্য প্রত্যাবর্তন এবং আকাশে নিঃসঙ্গ চিলের সাঁতার এ-সকল কিছুই প্রতীকী তাৎপর্যে পাঠকৃতির পরিণতির আভাস দেয়। বস্তুত, রঘুপতির ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার, নক্ষত্র রায় ও গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধের বিস্তৃতি রহস্যপূর্ণ প্রকৃতির সাংকেতিক পরিবেশনায় উপস্থাপিত হয়েছে। আবার এরই মধ্যে নিবিড় মহীরুহের নীরব অভিব্যক্তি যেন এই অন্ধাকার প্রকৃতির মাঝেই অত্যাসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সজাগ থাকবার ইঙ্গিত দেয়। ৬, ৭, ৮ এবং ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে গোবিন্দমাণিক্যের সুনিবিড় মানবপ্রীতিই যেন নান্দনিক মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে রক্ষণশীল রাজপুরোহিত রঘুপতি এবং ক্ষমতাতৃষ্ণার কলুষিত দ্বন্দ্বে পরাস্ত শাহ সুজার বিবর্তিত

Dhaka University Institutional Repository

মনোচেতনায়। রঘুপতির ধর্মীয় আবেগের অন্তস্তলে লালিত লৌহকঠিন অহংবোধ শেষপর্যন্ত নিজের 'বৃহৎ ছায়া'র সঙ্গে মীমাংসিত হতে চায়, বেদনাদগ্ধ দীর্ঘশ্বাস আর দার্শনিক উপলব্ধির চিহ্নায়ন ঘটায়। অহংতাড়িত রঘুপতি রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তাতে ক্রমাগত সে হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ। পুত্রতুল্য শিষ্য জয়সিংহের আত্মহনন, ক্রীড়নক নক্ষত্র রায়ের বিচলিত আচরণ সকল কিছুই শেষ পর্যন্ত তার কর্মপন্থাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে, এমনকী রঘুপতি নিজেও রক্তাক্ত মতাদর্শে অবিচল থাকতে পারেনি। এই পরাভূত অহংবোধই অস্পষ্ট ছায়ার উপমানে কখনো-বা 'একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দের' প্যারাডাইমে রঘুপতির মনোজগৎকে চিত্রকল্পের আশ্রয়ে শিল্পিত করতে চেয়েছে। রঘুপতির এই আত্মোপলব্ধি, গোবিন্দমাণিক্যের চূড়ান্ত জীবনার্থে সমীকৃত হওয়ার তৃষ্ণা— এ সকলকিছুই উল্লেখিত চিত্রকল্পে নান্দনিক সার্থকতায় স্থান পেয়েছে।

[খ] চেখের বালি

উপন্যাস রচনার প্রস্তুতিপর্বের শিল্প-সফল উত্তরণের ধারায় বিশ শতকের নবীন প্রেক্ষাপটে রচিত হয় *চোখের বালি*। বলা যেতে পারে, 'মানবস্বভাবের অমীমাংসিত স্তরের অনুসূক্ষ্ম জটিলতার রূপান্কণ-অনিবার্যতা দ্বারা 'চোখের বালি'র ঘটনাবিন্যাস, নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত' (সৈয়দ আকরম হোসেন; ১৬৩:১৯৮৮)। ফলে, এর পাঠকৃতিতে বিন্যস্ত উপমা-চিত্রকল্পের বিন্যাস এবং এদের চিহ্নায়ন পরিক্রমাও ওই শিল্পলক্ষ্যে সমীকৃত। উপন্যাসের সূচনা থেকেই নানাবিধ মানবিক সম্পর্কের জটিলতা ও তাদের বহুভূজ বিন্যাস উপন্যাসের আকরণে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃজন করেছে। মহেন্দ্র-আশা-বিহারী, রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্র-আশা, আশা-বিনোদিনী-মহেন্দ্রের আন্তঃসম্পর্কী দ্বন্দ্বময়তা যেন বহুমাত্রার জ্যামিতিক অভিক্ষেপ সঞ্চারের মধ্য দিয়ে অধিকতর ঘনীভূত হয়েছে। ফলে, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সামন্ত-শিকড় উৎসারিত বাঙালি মধ্যশ্রেণীর মানবিক ও মানুষিক দ্বন্দ্বের ক্রমজটিল শিল্পভাষ্য। উপমা উপ-তালিকার ৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিধৃত রাজলক্ষ্মীর অপত্যস্নেহজাত ঈর্ষার চিহ্নায়নসূত্রে এই জালিকাসদৃশ পারিবারিক জীবনকাঠামোর সংকট-অভিমুখ নির্দেশিত হয়েছে। যে মহেন্দ্রর জীবন এতকাল কেবল রাজলক্ষ্মীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে, যার মনের কেন্দ্রবিন্দুতে মায়ের অবস্থান ছিল অনন্য; সেই 'কাঙারু-শাবক' পুত্রের পরিণয়-আবেগের অতি-উচ্ছ্বাস তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। রাজলক্ষ্মীর এই আচরণের চিহ্নায়নে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ব্যতিক্রমী প্যারাডাইমসূত্র। প্রসঙ্গ লক্ষণীয়:

> বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ৭, *চোখের বালি*)

পুত্রের প্রতি এই অভিমান-আবৃত ভালবাসা উপমা উপ-তালিকার ৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পুত্রবধূ আশার প্রতি প্রকাশিত বিরূপ মনোভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আশার প্রতি মহেন্দ্রের জগৎসংসার-বিস্মৃত মোহাবিষ্ট প্রেমাকর্ষণ সরলা হরিণী আশাকে করে তুলেছে কর্তব্যবিমূঢ়, হতবিহ্বল। অপরদিকে, এই সংজ্ঞাপন জটিলতায় আশা এবং রাজলক্ষ্মীর পারস্পরিক দূরত্ব ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় রাজলক্ষ্মীর গ্রাম-যাত্রা, জ্ঞাতি সম্পর্কিত বিনোদিনীকে নিয়ে শহর প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনার অনুষঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের আখ্যানকে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক চিহ্নায়নের উপযুক্ত করে তুলেছে। রাজলক্ষ্মীর অভিমান-ক্ষুব্ধ মনোভঙ্গি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নিচের উপমান চিহ্নে :

> গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। (পরিচ্ছেদ ৬, *চোখের বালি*)

রাজলক্ষ্মীর এই নিগূঢ় ক্ষোভ এবং অপত্যবিচ্ছেদের আশঙ্কা উপন্যাসের দ্বন্দ্ব-বিন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা, এরই ফলস্বরূপ, আশ্রিতা বিনোদিনীকে তিনি আশা অপেক্ষা অধিক মর্যাদায় ও স্নেহে আপন সংসারে প্রবেশাধিকার প্রদান করেছেন। যদিও বিনোদিনী আপন চারিত্র্যগুণেই আলোচ্য উপন্যাসের সর্বাধিক সক্রিয় ও প্রভাববিস্তারী চরিত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীর অতিরিক্ত আগ্রহই তাকে এই পরিবারের কেন্দ্রে অবস্থান প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। বিনোদিনীর এই প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশার দ্বৈরথ শিল্পায়িত হয়েছে সমগ্র উপন্যাসে। এরইসঙ্গে অন্বিত হয়েছে বিনোদিনী-বিহারী-আশা-মহেন্দ্রের জটিল মনোসমীক্ষণের নান্দনিক চিহ্নায়ন। প্রসঙ্গত, উপমা উপ-তালিকার ১০ থেকে ১৮ সংখ্যক দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। 'মধ্যাহ্নের বালুকা', কিংবা 'মরুভূমির বাতাস' এর প্যারাডাইম ব্যবহার করে বিনোদিনী চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ যে নিপুণ সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জায় বিন্যস্ত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রটির জীবনপ্লাবী অচরিতার্থতা, ব্যর্থ অস্তিত্বের নিগূঢ় সংক্ষোভ, আপন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণকে প্রতিষ্ঠিত করবার আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষারই শিল্প-দ্যোতক। এরই সমর্থন লক্ষ করা যায় উপমা উপ-তালিকার ১০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। যথেষ্ট যোগত্যা থাকা সত্ত্বেও মহেন্দ্রকে পায়নি বিনোদিনী, বরং তাকে মেনে নিতে হয়েছে এক দুঃসহ বৈধব্যেরভার; সেই মহেন্দ্রকেই বিনা আয়াসে লাভ করেছে আশা। জীবন-ব্যাপ্ত অতৃপ্তির এই ক্ষোভকে সে মেনেও নিতে পারেনি, আবার এক মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়:

> অপরাহ্ণে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাঁহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। (পরিচ্ছেদ ১১, *চোখের বালি*)

অবচেতনায় লালিত এক অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় সে আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্যগল্প শ্রবণের মধ্য দিয়ে এক সংক্ষুব্ধ আনন্দকে আত্মস্থ করতে চেয়েছে। বলা যায় যে, ১২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিনোদিনীর মানসিক অস্থিতিশীলতাই যেন ইন্দ্রিয় বিপর্যাসে চিহ্নায়িত। বিনোদিনীর ঈর্ষা, অপ্রাপ্তির বেদনা আর তার বিক্ষিপ্ত বিকার অন্যদিকে আশার সরল আবেগময় অগভীর মানসিকতা— এই দুইয়ের আপাত সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চোখের বালির নামকরণের মধ্য দিয়ে উভয়ের 'সইআলী' সম্পর্কের সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ এই অন্তঃসারশূন্য সম্পর্কের উদ্ভবের চিহ্নায়নে ব্যবহার করেছেন রূপকথার অনুষঙ্গ। 'জাদুকরের মায়াতরুর' ছদ্ম-অস্তিত্বের মতোই আশা আর বিনোদিনীর সই-সম্পর্ক অকস্মাৎ উদ্ভূত এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতিপ্রাপ্ত। ধারাবাহিকতাবিহীন বিকাশশূন্য এই সম্পর্ক যেন রূপকথার কল্পবাস্তবতায় জন্ম নেয়া কোনো আবেগমাত্র। অপরদিকে, মহেন্দ্রর অবিবেকী অধিকারচেতনাকে সবেগে প্রত্যাখ্যান করে এর বিপরীতে বিহারীর নির্মম সত্যভাষণে বিনোদিনী কখনো 'স্বপ্নচালিতের' ন্যায় বেদনাহত, কখনো-বা 'মন্ত্রাহত ফণিনী'র মতো এক সুগভীর নান্দনিক বোধে বাক্‌স্তব্ধ। উপন্যাসে মহেন্দ্র চরিত্রটি বিশৃঙ্খল মনোবিচলনে কখনো আশার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছে, কখনো-বা রুচিবোধ উৎকেন্দ্রিক আকর্ষণ-বন্যায় বিনোদিনীর প্রতি ধাবিত হতে চেয়েছে। তাই উপমা উপ-তালিকার ১৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নৌকার শিকলের উপমান ব্যবহার করে আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্যশৃঙ্খলকেই যেন প্রতীকাভাসে রূপায়ণ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ১৩ সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকেই আশা-মহেন্দ্রর এই ক্রমবিভগ্ন দাম্পত্যপ্রেম ভিন্ন প্যারাডাইমে উপন্যাসের পাঠকৃতিতে স্থান পেয়েছে। তাদের ভালোবাসার সুরভি কীরূপে ধীরে ধীরে ব্যর্থতা আর গ্লানির দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হল তাকেই উপমিত করা হয়েছে এই দৃষ্টান্তে। আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ত্রিভুজ সম্পর্কের জটিলতা সৃজনের সূচনা মুহূর্তে মহেন্দ্রর মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছিল তাই 'উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের' প্যারাডাইমে বিন্যস্ত হয়েছে।

চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১০ সংখ্যক দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন বিনোদিনীর প্রচণ্ড মনোবিক্ষোভকে ধারণ করে আছে, অপরদিকে মহেন্দ্রর স্থূলরুচির ঘৃণ্য বহিঃপ্রকাশকে রূপায়ণ করেছে। বিহারীর কাছে বিনোদিনীর একান্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো পত্র ঘটনাক্রমে মহেন্দ্রর হস্তগত হলে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সে তা বিনোদিনীর কাছেই ফেরত পাঠায়। বস্তুত, বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর আকর্ষণ ও প্রণয় বিনষ্ট করাই ছিল এই প্রবঞ্চনার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, বিহারীকে ভুল বুঝে সাময়িকভাবে বিনোদিনীও হৃদয়যন্ত্রণায় হয়ে ওঠে ক্রুদ্ধ। বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই ক্রোধকেই প্রদীপের শীর্ষচ্যুত জ্বলন্ত তৈলবিন্দুর সঙ্গে তুলনাবাচকতায় এক নান্দনিক চিত্রকল্পের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে বিনোদিনী কিংবা মহেন্দ্র রুচি ও মানসিকতার মানদণ্ডে মেরুদূর পার্থক্যচিহ্নিত হলেও দুজনেই আবেগী সংবেগে আন্দোলিত। কিন্তু বিহারী চরিত্রে নীতিবাদের প্রাধান্য তার আবেগ-অনুভবকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। ১১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিহারীর এই আবেগশূন্য নৈতিক অবস্থানটি ভিন্ন আবেদনে চিহ্নায়িত। তবে, পরোক্ষভাবে বিহারীর এই চারিত্র্য মহেন্দ্রের স্থূল আবেগ ও অগভীর জীবনবোধকেই স্পষ্ট করে তোলে। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই মহেন্দ্রর এই বিচলিত, প্রবৃত্তি তাড়িত চরিত্রবৈশিষ্ট্য নানাবিধ ঋণাত্মক চিহ্নায়কের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়েছে। মহেন্দ্র চরিত্রের এই অস্থিরতা আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্য সম্পর্ককে যে সংশয়-সমুদ্রে নিপতিত করে, তার প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। 'নীরবতার দুর্গপ্রাচীর'-এর রূপকাভাসে যেন আশা এবং মহেন্দ্রর প্রেমশূন্য নির্বাক-প্রায় দাম্পত্য সম্পর্ককে ঔপন্যাসিক চিহ্নায়িত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। কিন্তু 'সরলা' আশা এক পর্যায়ে বিনোদিনীর প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও চূড়ান্তভাবে মহেন্দ্রের পাতিব্রত্যে আত্মসমর্পণসূত্রে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে, এক মনোজটিল শিল্পসম্ভাবনা নিতান্ত সরলীকৃত সামন্ত সমাজ-সুলভ পরিণতিতে বিলীন হয়ে যায়। আশা, মহেন্দ্র কিংবা বিনোদিনীর এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিক্ষেপের সমান্তরালে বিহারী এক সুকঠিন নীতিবোধ দ্বারা পূর্বাপর নিয়ন্ত্রিত। বিনোদিনীর প্রতি প্রারম্ভিক ঘৃণা, আশার প্রতি বিশিষ্ট প্লেটোনিক প্রেমসম্পর্ক কিংবা মহেন্দ্রর নৈতিক অস্থিরতার কঠোর সমালোচনা এ সকল কিছুই একটি অনড়-প্রায় নীতিগত অবস্থান থেকে বিহারী চরিত্রে স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, *চোখের বালি* উপন্যাসের পাঠকৃতিতে বিন্যস্ত সামগ্রিক জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক অভিক্ষেপ, এক সুনিবিড় নান্দনিকতায় আলোচ্য উপমা ও চিত্রকল্প সমন্বয়ে পরিবেশিত ও রসসিক্ত হয়েছে।

[গ] নৌকাডুবি

প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকস্মিকতায় মানবজীবনে সংঘটিত নানাবিধ বিপর্যয়-বিন্যাস আবার শেষ পর্যায়ে আকস্মিকভাবেই সকল বেদনার ইতিবাচক সমাধান সৃজন— এই দুয়ের দোলাচল *নৌকাডুবি* উপন্যাসের শিল্পসংকটে নিহিত। তবে এ উপন্যাসের আখ্যান ও চরিত্রচিত্রন শৈল্পিক উচ্চতা অর্জনে ব্যর্থ হলেও এর উপমা-চিত্রকল্পের বিন্যাস ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের আত্ম-অতিক্রমী প্রবণতার শিল্প-স্মারক। বিশেষত আখ্যানবর্ণনার অনুষঙ্গী বস্তু পরিপ্রেক্ষিত সৃজনে তিনি যে নান্দনিক সূক্ষ্মতাকে ধারণ করেছেন তা প্রায়শই এই উপন্যাসের বিশেষ ঘটনা কিংবা চরিত্রের গতি প্রকৃতি নির্দেশে আভাসিত হয়েছে। আর এরই মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছে এক নতুন ধরনের রোমান্স উপন্যাস। রচনাটির পটভূমি সৃজনে রয়েছে রোমান্সের আবহ, যদিও এর বিন্যাস ও বিস্তৃতিতে সচেতনভাবে এই শিল্পপ্রবণতা পরিহার করার চেষ্টাও সমানভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের অবচেতনালালিত প্রেরণায় কখনো-কখনো কিছুটা আকস্মিকভাবেই এতে রোমান্সের অনুপ্রবেশ ঘটে গিয়েছে। বিভিন্ন উপমা-চিত্রকল্পের গঠনেও এই মন্তব্যের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপমা উপ-তালিকার ১৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে যে রহস্যময় পরিবেশ সৃজিত হয়েছে তা-ও এই রোমান্সের আবেদনকেই চিহ্নায়িত করে। উলঙ্গ শিশুর ঊর্ধ্বমুখে শয়ানের যে উপমান এই দৃষ্টান্তে ব্যবহার করা হয়েছে, তা মূলত রমেশ এবং কমলার ভুলের মধ্যে জন্ম নেয়া অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্কের শিল্প-ইঙ্গিত। উদ্বাহু উলঙ্গ শিশুর প্যারাডাইমে সদ্যজাতকের নিষ্পাপ অভিব্যক্তি রমেশ-কমলার নিষ্কলুষ মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককেই প্রতীকী আবহে চিহ্নায়িত করে। একইসঙ্গে, এই নৌ-দুর্ঘটনাকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন প্রয়াস উপন্যাসের পাঠকৃতিতে প্রয়োগ করেছেন তার নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। 'প্রেতলোকের মতো পাণ্ডবর্ণ' বালুচর, কিংবা 'অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো' নদীতীর যেন রমেশ-কমলাকে এক বিষণ্ন ও ভয়াবহ সামাজিক জটিলতায় অস্তিত্বহীন শূন্যতার দিকে ধাবিত করার চিত্রকাল্পিক পূর্বাভাস। এ পূর্বাভাসই সত্য হয়ে উঠেছে রমেশ যখন উদ্ঘাটন করেছে যে কমলা তার বিবাহিত স্ত্রী নয়। স্বভাবদুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত অথচ নৈতিকতাপ্রভাবিত রমেশের এই আবিষ্কার তাকে সাময়িকভাবে হলেও করে তুলেছে বিবশ, কর্তব্যবিমূঢ়। ফলে, হেমনলিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রেক্ষাপটও হয়ে উঠেছে দ্বিধা ও শঙ্কাদীর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ২১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে, প্রাকৃতিক উপমানগুচ্ছের প্যারাডাইম ব্যবহার করে রমেশের পিতার মৃত্যুসংবাদের সূত্র ধরে রমেশ-হেমনলিনীর পারস্পরিক সংশয়ের প্রাথমিক সূচনাকে আপাতভাবে স্তিমিত করা হয়েছে, এমনকী উভয়ের বিবাহের উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে। এ যেন রমেশের প্রতি হেমনলিনীর আস্থা ও বিশ্বাসের শিল্পভাষ্য। অক্ষয়ের সূত্রে রমেশ-কমলার প্রকাশিত সম্পর্কের কথা অবগত হয়েও এক অবিচল বিশ্বাসে হেমনলিনী রমেশকে বিস্বস্তরূপেই গ্রহণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমলার প্রতি রমেশের দায়িত্ব-জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা প্রভৃতি পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বকে সক্রিয় করে তুলেছে। এরই শিল্প নির্দেশনা লক্ষ করা যায় ২২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। আপাতভাবে, এই বিবরণধর্মী উপমা আসন্ন পূজার কলকতাকে নির্দেশ করলেও এর মধ্যে রয়েছে অনিবার্য সংকট এবং তা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে আকস্মিকভাবে উত্তরণের আভাস। কেননা, পূজার ছুটিতে কমলাকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে এসে আপন গৃহে রাখবার মধ্যে যে নীতিগত ও প্রণয়গত বাধা রমেশ অনুভব করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসে সকল নাটকীয় জটিলতার জন্ম হয়েছে। রমেশ নিজের বিবাহ হেমনলিনীর সঙ্গে স্থির করেও বারবার তা স্থগিত করেছে। এমনকী নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করেও তার দ্বিধার অবসান ঘটেনি। তাই ২৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'গঙ্গাযমুনার মতো সাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা'-র আবহে ঔপন্যাসিক রমেশের নীতি ও আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যে জন্ম নেয়া দ্বিধাকে রূপায়ণ করেছেন। কিন্তু এই আবেগতাড়িত, ক্ষণস্থির রমেশকে কখনোই অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি হেমনলিনী। এ কারণেই সচেতনভাবে সংক্ষুব্ধ হয়েও হেমনলিনী এক প্রগাঢ় আবেগে আদ্যন্ত তাকে আকঁড়ে থেকেছে, যার শৈল্পিক নির্দেশনা মাতৃপ্রতিমার অপূর্ণাঙ্গ প্রত্ন-অবয়বের চিহ্নায়কে উপস্থাপিত হয়েছে ২৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। হেমনলিনীর এই স্থির প্রেমানুভব রমেশকেও সাময়িকভাবে মনোগত দ্বন্দ্ব-জটিলতা থেকে মুক্তি প্রদান করলেও তা ক্ষণস্থায়ী শুভ-সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলে পুনরায় উভয়ের সম্পর্ককে সংকটাপন্ন করেছে। রমেশ-হেমনলিনীর এই পরস্পর জটিলতার বিপরীত কোটিতে কমলা ক্রমশ নিরস্তিত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে। নদীপথে ভ্রমণের সময় যে কটি দিন সে রমেশকেই স্বামী বিবেচনায় দাম্পত্য ঘরকন্যার সুখস্বাদ গ্রহণ করেছে সে কটি দিনই তার জীবনে 'সরল কবিতার মতো', আভাসিত হয়েছে সহজবোধ্য অনুভবের পূর্ণতায়। এরই শিল্পরূপায়ণ ঘটেছে ২৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। কিন্তু ঐ নদীবক্ষেই শিকড়বিহীন ভাসমান দাম্পত্যজীবনের অন্তঃসারশূন্যরূপ আবিস্কৃত হওয়া মাত্রই এক নির্দেশনাশূন্য জীবন-অভিব্যক্তি গ্রাস করেছে তাকে। কিন্তু এই নির্বেদ-অভিমুখী অনুভবে কমলা অবসিত নয়, বরং প্রায় সমসময়েই হৃদয়গহীনে তার প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষকে ফিরে পাবার ক্ষীণ সম্ভাবনাকে লালন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে সে। কমলার এ মনোসমীকরণ রূপায়িত হয়েছে উপমা উপ-তালিকার ২৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। রমেশের সঙ্গে মনোগত দ্বৈরথ, তার সঙ্গ ত্যাগ করে নলিনাক্ষের সন্ধান প্রচেষ্টা, পরিস্থিতির কারণে কাশীতে গৃহপরিচারিকার জীবিকা গ্রহণ, আকস্মিকভাবে নলিনাক্ষের সন্ধানলাভ, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাশী ছাড়তে বাধ্য হওয়া— এ-সকল ঘটনার দ্বান্দ্বিকতায় কমলার মনোপরিস্থিতিকে চিহ্নায়িত করে এই উপমা। বস্তুত, 'মত্তহস্তী'র নির্বিকার নির্মমতার অনুষঙ্গে কমলার জীবনকাহিনীকে রূপকায়িত করে, নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার মিলনপ্রত্যাশার তীব্রতাকেই ঔপন্যাসিক নির্দেশ করেছেন। একইসঙ্গে, কমলার মনোজগতের আশা-নিরাশার দোলাচলও বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে এই শিল্প-দৃষ্টান্তে।

রমেশের জীবনে নৌকাডুবি তার সরল দ্বন্দ্ববিহীন জীবনকেও করেছে নিমজ্জিত। পারিস্থিতিক কারণে অন্যের পত্নীকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ অথচ আপন প্রণয়িনীর প্রতি শতভাগ বিশ্বস্ত রমেশের মনোজগৎ রূপকের আভাসে প্রকাশ পেয়েছে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। কমলা এবং হেমনলিনীকে ঘিরে রমেশের নৈতিক দায় ও স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যকে মুর্চ্ছিতের হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার বিহ্বলতার অনুষঙ্গে এই চিত্রকল্প ধারণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতার শৈল্পিক সংকেত উচ্চারিত হয়েছে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। গ্লানিদগ্ধ রমেশ আবেগের প্রাবল্যে বিবাহের তারিখ পরিবর্তনের যে প্রস্তাব হেমনলিনীর পরিবারে উথাপন করে, তা প্রকৃতপক্ষে উভয়ের সম্পর্কের চূড়ান্ত জটিলতার শীর্ষমুহূর্ত। আখ্যানের এই গতিধারাই চিহ্নায়িত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে শরৎ প্রকৃতির বেদনাবিধুর অভিব্যক্তির আশ্রয়ে। আপন প্রণয়িনীর সঙ্গে এই জটিলতার বিপরীত কোটিতে কমলার প্রতি নৈতিক দায় অস্বীকার করতে পারেনি রমেশ। পাঠকৃতিতে আবেগী দ্বন্দ্বে রমেশ মূলত বিক্ষত। কিন্তু রমেশের ব্যক্তিত্ব কখনোই উপন্যাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হওয়ায় কেবল এক অন্তর্লীন বেদনায় প্রণয় ও দায়বদ্ধতার টানাপোড়েনে মুহ্যমান থেকেছে, কখনোই কোনো সাহসী শুদ্ধতম অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে প্রতিহত করতে এগিয়ে যায়নি। এ কারণেই রমেশের এই সংগুপ্ত আবেগকে ১৬ এবং ১৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে উপস্থাপিত চিত্রকল্পের আশ্রয়ে রূপায়ণ করা হয়েছে। এরইসঙ্গে সম্পর্কিত করে উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে কমলার যন্ত্রণাবিদ্ধ অবয়ব। ১৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে কমলার এই বিপন্ন চেতনার প্রকাশে 'শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চিৎকার'-সদৃশ ইঙ্গিতবাহী চিহ্নায়ক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে *নৌকাডুবি* উপন্যাসের নান্দনিক অভিযাত্রা হয়ে উঠেছে কবিতাস্পর্শী।

[ঘ] গোরা

গোরা রবীন্দ্রনাথের 'নিচ্ছিদ্র-প্রায় শিল্পনিপুণ উপন্যাস'[১]। রচনার পাঠকৃতিতে পূর্বাপর এই শিল্পসাফল্যের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট। বিশেষত এর উপমা-চিত্রকল্পের বর্ণিল সম্ভার রবীন্দ্র কথাসাহিত্যকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করেছে। রাবীন্দ্রিক তত্ত্ববোধ ও দার্শনিকতা এই উপন্যাসের শিল্প-আবেদনের সঙ্গে অভূতপূর্ব সার্থকতায় সমন্বিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরা দেশ-কাল ও সমাজ বাস্তবতায় যে মূলীভূত বিশ্বাসকে লালন করতে চেয়েছে, তা আপাতভাবে রক্ষণশীল হলেও এর অন্তস্তলে সক্রিয় থেকেছে স্বদেশানুরাগ, উপনিবেশিত ভারতের মুক্তির প্রত্যাশা। এরই সমর্থন লক্ষ করা যায় উপমা উপ-তালিকার ২৭ ও ২৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। এক সুতীব্র আবেগে পুনর্জাগরণবাদী প্রেরণা আর নিজের অস্তিত্বসন্ধানী আকাঙ্ক্ষায় গোরা যে জীবনলক্ষ্যে নিজেকে সঞ্চালিত করেছিল তারই তীব্র সমর্থন এবং যৌক্তিক নির্দেশনা এ দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিন্যস্ত। সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষাপটেই এই যৌক্তিক তর্কপ্রবণতা স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও *গোরার* পাঠকৃতিতে তত্ত্বধর্মিতা প্রাধান্য পেলেও কখনোই তা তত্ত্বভারাক্রান্ত নয়, বরং পূর্বাপর তত্ত্বাবেগের নির্যাসশক্তিতে স্বতঃস্ফূর্ত। উপমা উপ-তালিকার ২৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে এই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোরার ধর্মজিজ্ঞাসা কিংবা হিন্দুত্বের জাগরণ-স্পৃহা যে পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষকেই আঁকড়ে ধরবার বিশিষ্ট প্রবণতা তাই যেন চিহ্নায়িত হয় এই দৃষ্টান্তে। নিজের এই তত্ত্বাভিযানকে গোরা উপমিত করেছে সমুদ্রগামী জাহাজের পরিচালকের সঙ্গে। এক সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসকে হৃদয়ে লালন করে সে যে পূর্ণাঙ্গ মানবমুক্তির স্বপ্ন-সাধকে বহন করে চলেছে, তারই নান্দনিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে এই উপমায়। সমগ্র পাঠকৃতিতেই ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে গোরার চরিত্রকাঠামো, তার 'মহাকাব্যপ্রতিম' শিল্প-অস্তিত্ব। তার অনন্যসাধারণ একাগ্রতা, ব্যক্তিত্বের নিগূঢ়তার চিহ্নায়নে রবীন্দ্রনাথ আপাত অপ্রচল উপমান ব্যবহার করেছেন উপমা উপ-তালিকার ৩২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সাপ সাধারণত জীবনের না-বোধক ক্রিয়াশীলতা ও প্রবণতাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু মানবসভ্যতার একাধিক মিথ-উৎসে সাপ ব্যবহৃত হয় জীবনীশক্তির প্রতীকরূপে, সৃষ্টির আদিম

[১] সৈয়দ আকরম হোসেন: ২২১: ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুষঙ্গে। এই মৌল মিথচেতনা সম্ভবত সক্রিয় থেকেছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তায়। এ কারণেই গোরার প্রাণপ্রাচুর্যের চিহ্নায়নে তিনি সাপের খাদ্য গলাধকরণের ইমেজকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছেন। গোরা এবং তার স্বোপার্জিত বিশ্বাস যে অভিন্ন সত্তায় সমীকৃত সেই অনুভবকে স্পষ্ট করে তুলতে ঔপন্যাসিক ছিলেন সদাসতর্ক। 'তত্ত্ব-প্রতিভূ চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যযোজনাসামর্থ্যের অন্তরালে সক্রিয় থেকেছে ঔপন্যাসিকের কতিপয় নিগূঢ় চেতনা— প্রথমত, জীবনের চলমানতা, সমগ্রতা ও স্বাতন্ত্র্যে শ্রদ্ধাবোধ; দ্বিতীয়ত, যুগধর্মের আন্তঃঅসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বময়তা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অবিজ্ঞতা; তৃতীয়ত, নিসর্গও পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক গূঢ়তরবোধ এবং চতুর্থত, তত্ত্ব সম্পর্কে নিরুত্তেজ নির্মোহ ও প্রলোভন নিরপেক্ষতা। প্রকৃতপক্ষে, 'গোরা'য় বিধৃত তত্ত্বমূলক সমস্যাগুলির কেন্দ্রস্থলে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন তাদের মর্মকথা (সৈয়দ আকরম হোসেন; ২২৪: ১৯৮৮)। গোরা চরিত্রের এই বিকাশ পূর্ণতাস্পর্শী হয়ে উঠেছে বিনয়ের সম্পূরক সহাবস্থানে ও সুচরিতার ব্যক্তিত্বগম্ভীর প্রণয়ের উদ্ভাসনের মাধ্যমে। এ-কারণেই বিনয়ের সঙ্গে আপাত মতাদর্শের পার্থক্য কিংবা সুচরিতার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণয়কে সচেতনভাবে প্রথম পর্যায়ে প্রত্যাখ্যান করলেও গোরা চূড়ান্ত পর্যায়ে এই হার্দিক প্রণয় এবং সুগভীর সুহৃদসম্পর্কের নিকটই সমর্পিত। এরই শিল্পপ্রকাশ উপমা উপ-তালিকার ৪০ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। আপন জন্ম ইতিহাস আবিস্কৃত হলেও তাই গোরা কোনো অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয় না। বরং এক নবীন বোধে, নতুন জীবনচেতনায় সে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। ... আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি— মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। (পরিচ্ছেদ ৭৫, *গোরা*)

গোরার এই অস্তিত্বের পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়ার নির্যাসকেই আলোচ্য দৃষ্টান্তে রূপায়ণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রসমূহের প্রতি ঔপন্যাসিকের যে সমানুভূতি সম্প্রসারিত হয়েছে তার নান্দনিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। উপন্যাসের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র বিনয়ের ব্যক্তিত্ব, আবেগ, মানসিক দ্বন্দ্বকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের সচেতনাতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উপমা উপ-তালিকার ৩৫ ও ৩৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। গোরার সঙ্গে মতদ্বন্দ্ব, ললিতার দৃঢ়চেতা প্রণয়াবেগ বারবার বিনয়ের অন্তরকে যেভাবে সংকটাকুল করেছে, তারই শিল্প-অভিজ্ঞান এই সকল দৃষ্টান্ত। একইভাবে, সুচরিতা কিংবা ললিতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখিত উপমা উপ-তালিকার বিভিন্ন দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিহ্নায়িত। উপমা উপ-তালিকার ৩৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ললিতার যে তীব্র প্রণয়াবেগ সুচিহ্নায়িত তা প্রকৃতপক্ষে বিনয়ের মনোনির্দেশনাকেও সংকেতিত করে। ব্রাহ্ম সমাজের উপজাত অসংলগ্নতাকে উপেক্ষা করে যে প্রাণশক্তিতে তারা পরস্পর মনোগত ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে তা পরোক্ষভাবে গোরা-সুচরিতার সম্পর্ককে গভীরতর করে তুলতেও প্রেরণা জুগিয়েছে। উপন্যাসের পাঠকৃতিতে গোরা-সুচরিতার মানবিক সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ধরে নিরাকার থেকে গেলেও প্রতিকূল সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতেই উভয়ের দ্বন্দ্বময় মনস্তত্ত্ব সমীকৃত হবার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। গোরা-সুচরিতাকে ঘিরে সমাজ-পরিস্থিতিগত এই জটিলতাকে চিহ্নায়িত করবার প্রয়োজনে উপমা উপ-তালিকার ৩৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ব্যবহার করা হয়েছে আকস্মিক আক্রমণকারী শিকারী বাঘের অনুষঙ্গ। কিন্তু এই বিরূপ সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও গোরা এবং সুচরিতা তাদের মনোসংবেদনায় ধারণ করেছে পরস্পরের প্রতি এক সুগভীর সমমর্মিতা। তাই উভয়ের এই প্রচ্ছন্ন প্রেমসম্পর্ক যেভাবে সুচরিতাকে উদ্বেলিত করেছে তারই শিল্পসজ্জা স্পষ্ট হয়েছে উপমা উপ-তালিকার ৩৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। চাঁদ আর সমুদ্রের চিহ্নায়ক ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ যেন সুচরিতা এবং গোরার সম্পর্ককে সকল প্রাত্যহিক সমাজবাস্তবতার ঊর্ধ্বে তুলে চিরায়ত ও নিবিড় সম্বন্ধের সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জায় বিশিষ্টতা প্রদান করতে চেয়েছেন।

চিত্রকল্প উপ-তালিকার ১৯ থেকে ২২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে *গোরা* উপন্যাসের শিল্পসফলতার ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্জনা রূপায়িত। ২০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রাকৃতিক উপমান অনুষঙ্গকে অন্যাসক্ত আলঙ্কারের বিন্যাসে বিন্যস্ত করে গোরা এবং বিনয়ের বন্ধুত্বের টানাপোড়েনকে চিত্রকাল্পিক আবহে উপস্থাপন করা হয়েছে. ২০ ও ২১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন সুচরিতার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার সূত্রে গোরার তর্ককে অকুণ্ঠ জীবনীশক্তিতে চিহ্নায়িত করেছেন, তেমনি অপরদিকে গোরার স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত হৃদয়ের অন্তরালে মানবিক প্রেমসম্পর্কের যে বীজ লুকায়িত ছিল তার শিল্পনির্যাস আহরণের লক্ষ্যে তিনি নিসর্গের বিশিষ্ট সংবেদনাকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছেন। গোরার স্বদেশপ্রেম এবং প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মেলবন্ধনকে উপস্থাপন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করেছেন প্রকৃতির ইমেজ। তাঁর বোধ চিন্তার বিবর্তনমুখী বিকাশমানতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিচের দৃষ্টান্তে:

> বলিতে বলিতে গোরা মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া ছাতে বেড়াইতে লাগিল। পূর্ব দিকের উষার আভাস তাহার কাছে যেন একটা বাক্যের মতো, বার্তার মতো প্রকাশ পাইল; যেন প্রাচীন তপোবনের একটা বেদমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হইয়া উঠিল; তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল— মুহূর্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল— তাহার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ১৫, *গোরা*)

উদ্ভিদের প্যারাডাইম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গোরা চরিত্রের মূল প্রবণতাকে চিহ্নায়িত করার এই সফল প্রয়াস সমগ্র উপন্যাসের শিল্পরূপ নির্দেশেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসে, গোরার সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তির মধ্যেও বিনয়-ললিতার আবেগী অথচ প্রতিবাদী প্রেম-সম্পর্ক বিকশিত হয়েছে। *গোরা* উপন্যাসের এই বহুস্তরবিশিষ্ট মনোসমীক্ষণের অন্তর্দেশে সুগভীর আবেগ এবং উদারতম মানসিক প্রবণতায় বিমথিত প্রাণের উন্মোচন ঘটিয়েছেন গোরার মা আনন্দময়ী। প্রত্ন-মাতৃপ্রতিমার কাঠামোতে গড়া এই চরিত্র সমগ্র উপন্যাসের স্বয় (thesis) ও প্রতিস্বয়কে (antithesis) সমন্বিত করেছে। চিত্রকল্প উপ-তালিকার ২২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে দেবদূতের ইমেজ ব্যবহার করে আনন্দময়ীর যে অসাধারণ ঔদার্যকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে, তা এই উপন্যাসের নান্দনিক প্রবণতার বিশেষ তাৎপর্যবহ দিক। প্রত্ন-মাতৃস্বরূপের এই অভিপ্রকাশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নিচের উদ্ধৃতিতে:

Dhaka University Institutional Repository

> গোরা কহিল,"মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ! (পরিচ্ছেদ ৭৫, *গোরা*)

বস্তুত, সমগ্র উপন্যাসের পাঠকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে সুনির্বাচিত শৈল্পিক দক্ষতায় উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে অন্বিষ্ট ভাববিশ্বকে চিহ্নায়িত করেছেন তা বিশিষ্টতায় ব্যতিক্রমী, রসাবেদনে অনন্য।

[ঙ] চতুরঙ্গ

চতুরঙ্গ উপন্যাসের শিল্পবিন্যাস আধুনিক, রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতার সতত নিরীক্ষায় নবজাত বোধে উত্তীর্ণ। সূক্ষ্ম জীবনদর্শনপ্রত্যাশী মানবের ইতি ও নেতির সংকট এবং রূপ-অরূপ থেকে স্বরূপে উত্তরণের অভীপ্সা আলোচ্য উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্ববহ প্রান্ত। এ উপন্যাস থেকে নির্বাচিত উপমা-চিত্রকল্পের দৃষ্টান্তসমূহ পর্যবেক্ষণ করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব। উপন্যাসে মানবজীবনদর্শনের যে পরস্পর-বিপ্রতীপ স্তরের ক্রমবিন্যাসকে সমন্বিত করবার প্রয়াস লক্ষণীয় তার সূচনা ঘটেছে শচীশের সক্রিয়তায়। জ্যাঠামশাই এর মতাদর্শ প্রভাবিত নাস্তিক্যবাদ, বিস্তৃত মানববাদে যার পূর্ণতা, তাকে আত্মস্থ করেই শচীশের জীবনস্বরূপের প্রথমপর্ব বিন্যস্ত। শচীশের এই উদ্দাম বিশ্বাস ও মতাদর্শকে উপমা উপ-তালিকার ৪১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে জ্যোতিষ্কের উপমানে চিহ্নায়িত করা হয়েছে। বস্তুত, আলোচ্য উপমাটিতে রয়েছে উল্কা কিংবা ধূমকেতুর চিহ্নায়নের প্রচ্ছন্ন প্যারাডিগম্যাটিক বিবেচনা, যা একইসঙ্গে শচীশের প্রচণ্ডতা ও তার ক্ষণস্থায়িত্বকে শিল্পায়িত করে। বলা যেতে পারে, শচীশের এই বহির্মুখী মানসতার মূল শক্তি তার জ্যাঠামশাই। এ কারণেই জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু শচীশের এই প্রবণতারও তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটিয়েছে। তাই যে একসময় 'মশালের' মত জ্বলছিল, সে-ই 'প্রদীপে' রূপান্তরিত হয়ে নিমিষে নির্বাপিত হয়েছে। উপ-তালিকার ৪৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত, যে অধ্যাত্ম আবেগে শচীশ লীলানন্দস্বামীর দাসত্ব বরণ করেছে তারই পূর্বাভাস ধ্বনিত হয়েছে উপমা উপ-তালিকার এই দৃষ্টান্তে। শচীশ যেন গতিময় রূপজগৎ থেকে সুস্থির অরূপলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সেখানেও স্থিত হয়নি সে; বরং চেতনার গহীন থেকে উৎসারিত এক পরিপূর্ণ জীবনার্থে সে অবশেষে পরিণতিপ্রাপ্ত। শচীশের এই আত্মপরিক্রমায় বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে শ্রীবিলাস ও দামিনী। শচীশের সুতীব্র ব্যক্তিত্বে শ্রীবিলাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সঙ্গে এক গভীর অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু শচীশের রসপ্লাবী অধ্যাত্মবাদে আত্মসমর্পণকে সে নিশঙ্ক চিত্তে সমর্থন করতে পারেনি। যদিও এক অবিচল ভালবাসার আকর্ষণে শ্রীবিলাস কখনোই শচীশকে ত্যাগ করতে পারেনি কিংবা তার থেকে মনোগতভাবে বিচ্ছিন্নও হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদিন সে লীলানন্দস্বামীর সাহচর্যে থেকেছে এক মুহূর্তের জন্যও কোনো নির্দ্বন্দ্ব প্রেরণায় সেই ভক্তিরসে আত্মসমর্পণ করেনি। শচীশের মত সত্তাসন্ধানী অভিযানে অংশ না নিয়েও এক স্বোপার্জিত জীবনদর্শনকে আপন চেতনায় ধারণ করেছে শ্রীবিলাস। এই ব্যতিক্রমী বোধের শিল্পপ্রকাশ ৪৪ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। প্রাথমিক বিবেচনায় উপন্যাসে শ্রীবিলাসের ভূমিকা কথকের হলেও সে ক্রমশ হয়ে উঠেছে এই

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ, যে নিজস্ব আদর্শবোধকে আপন-অস্তিত্বের কেন্দ্রে প্রোথিত করে অণুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শচীশ এবং দামিনীর মনোবিন্যাসকে পর্যবেক্ষণ করেছে। একইসঙ্গে, উপন্যাসের পরিণতিমুখী অংশে দামিনীর সঙ্গে এক অনন্যদৃষ্ট সমঝোতাপূর্ণ প্রেমসম্পর্কে জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করেছে। শ্রীবিলাসের চোখে শচীশের যে ক্রমরূপান্তর ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার নির্দেশনা লক্ষ করা যায় ৪৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সূত্রছিন্ন ঘুড়ির উদ্দেশ্যবিহীন উড়ে যাওয়ার সঙ্গে শচীশের মনোপরিস্থিতিকে তুলনা করবার মধ্য দিয়ে শ্রীবিলাস যেন শচীশের জীবনবোধের প্রতিস্বয়-পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন করেছে। একইভাবে, উপন্যাসে শ্রীবিলাসের দৃষ্টিকোণ থেকেই চিরবঞ্চিতা দামিনীর সংক্ষোভ, শচীশের সঙ্গে তার ক্ষণকালীন প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ অথচ অনন্ত প্রেমসম্পর্ক, আবার জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর স্বল্পায়ু দাম্পত্যজীবন— এই সকলকিছুই বিশিষ্ট আবেগঘন নান্দনিকতায় সুচিহ্নিত হয়েছে। জীবনবিপুল অচরিতার্থতা আর দমিত আত্মপরিচয় দামিনীকে নিয়ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এই তীব্র জীবনতৃষ্ণাকে শ্রীবিলাসের পার্থিব জীবন-অভিমুখী দৃষ্টিপ্রতিবিম্বে ভিন্ন মাত্রার উপমায় শিল্পায়িত করা হয়েছে ৪৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। উপমা গঠনের প্রচল সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জা থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচিত প্যারাডাইমের বিপরীত সংশ্লেষে গঠিত এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় দামিনী পদ্মপাতার শিশিরের ফোঁটা না হওয়ার মধ্য দিয়েই এক অনমনীয় দৃঢ় বস্তু-অস্তিত্বকে আপন অন্তরে ধারণ করেছে। অন্যদিকে, দামিনী সম্পর্কিত এই উপলব্ধি শ্রীবিলাসের সুষম চেতনাজগতেই সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে। শচীশ যেখানে রূপ আর অরূপের দোলায় সত্তার কাছে মীমাংসিত হবার তাড়নায় দামিনীর স্বরূপ অনুধাবনে আগ্রহী হয়নি, সেখানে শ্রীবিলাস আপন মানবিক চেতনায় দামিনীর ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। দামিনী চরিত্রের এই বিশেষত্বর মধ্যে রয়েছে তার জীবনার্থের সংরূপ। তার অমোচনীয় যন্ত্রণাবোধ ক্রোধের রূপ নিয়ে ৪৭ সংখ্যক উপমা-দৃষ্টান্তে সংকলিত হয়েছে। লীলানন্দস্বামীর আধ্যাত্মিক আহ্বান দামিনী প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ শচীশের কাছে সর্বান্তকরণে সমর্পিত হয়েও সে পেয়েছে উপেক্ষা। নিদ্রিত শচীশের অবচেতন পদাঘাত তার বুকে ও অন্তরে অমোচনীয় সুখক্ষত রেখে গেছে। জীবনের পাওয়া না পাওয়ার ব্যবধান কমিয়ে আনতে শ্রীবিলাসের সঙ্গে সে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও আমৃত্যু শচীশের প্রতি অচরিতার্থ প্রেম-মমতায় উজ্জীবিত থেকেছে। কিন্তু দামিনীর বহুস্তরিক মনোকাঠামো একইসঙ্গে অনুধাবন করেছে শ্রীবিলাসের নিখাঁদ প্রেমাভিব্যক্তি। তাই প্রত্যাশাশূন্য একান্তনিবেদিত আবেগে শচীশের প্রতি দামিনী যেমন চিরসমর্পিতা থেকেছে, তেমনি তার অন্তর জুড়ে মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীবিলাসের প্রেম শ্রেষ্ঠতম সুখের ব্যঞ্জনা ছড়িয়েছে। দামিনীর হৃদয়ের এই বহুস্বরিক অভীপ্সার ব্যাপ্তি গভীর কিন্তু তার প্রকাশ স্বল্প। উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়ে তার অনির্বাপিত ক্ষোভ, আর অভিমান যেন বারবার অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতো প্রকট হয়ে উঠেছে। দামিনীর অপ্রাপনীয়তায় ভরা জীবনে জমা হওয়া ক্রোধ তাই বাঘের জ্বলন্ত চোখের সঙ্গে প্রতিতুলিত হয়েছে। অপরদিকে, শ্রীবিলাস বিদ্যুৎময়ী দামিনীর প্রতি একান্ত প্রেমানুভূতিতে দামিনী-শচীশের ক্ষণস্থায়ী অথচ অনন্ত প্রেমসম্পর্ককে অতিক্রম করতে চেয়েছে রূপকথার সরলতায়; জাদুকরী রূপকথার ছোঁয়ায় পেতে চেয়েছে জীবনের অধরা আকাঙ্ক্ষাকে। তাই সে দামিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। উপমা উপ-তালিকার ৪৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে চিহ্নায়িত হওয়া শ্রীবিলাসের এ আকাঙ্ক্ষা রূপকথার মতোই মানস-বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের কারণেই শচীশ কখনো শ্রীবিলাস-দামিনীর দাম্পত্যজীবনে দেওয়াল তুলে দাঁড়ায়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহসম্পর্ক রূপকথার জাদুকরের মায়ায়ঘেরা বাস্তবতার মতোই সর্বদা এক ভিন্ন জগতে বিচরণ করেছে। এরই মধ্য দিয়ে উপন্যাসে মানব অন্তরের চিরায়ত জটিলতাকে আধুনিক শিল্পভাষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে এ উপন্যাসে।

চিত্রকল্প উপ-তালিকাভুক্ত *চতুরঙ্গ* উপন্যাস থেকে নির্বাচিত উদাহরণসমূহ মূলত রচনাটির নান্দনিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিনিধি। বিশেষত শচীশ, দামিনী এবং শ্রীবিলাসের দোলাচলতাড়িত হৃদয়ের শিল্পভাষ্য সৃজনে উপমার পাশাপাশি এ সকল বহুমাত্রিক চিত্রকল্প উপন্যাসের পাঠকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত, ২৩ সংখ্যক দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। দামিনী চরিত্রের কেন্দ্রীয় প্রবণতা কীভাবে তার নামের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে গেছে তা স্পষ্ট করে তুলতে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ বর্ষাকাশের তড়িৎচমকের চিত্রকাল্পিক অনুষঙ্গ। দামিনী তার ভেতরে-বাইরে জাগতিক প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার যে বিদ্যুৎপ্রতিম চাঞ্চল্য ও চমক লালন করেছে তারই শিল্পরূপ এই চিত্রকল্প। দামিনী চরিত্রের ক্ষোভ এবং আবেগের তীব্রতা দুইই এই উপমা-আশ্রিত সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জার আশ্রয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এ মন্তব্যের সম্পূরক বিবেচনায় ২৬ সংখ্যক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে। যে ঘৃণা ও ক্ষোভে দামিনী পূর্বাপর লীলানন্দস্বামীর আচরিত জীবনপথকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, দুর্বিনীত ব্যবহারে নিজের বঞ্চনাময় নিয়তিকে আঘাত করেছে, তারই চূড়ান্ত প্রকাশ এই চিত্রকল্প। লীলানন্দের রসবাদী জীবননির্দেশনার মধ্যেও যে পঙ্কিলতা বিদ্যমান, তা পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র গুরুভক্ত নবীনের পরকীয়া প্রেমের জৈবিক স্থূলতায় এবং এরই সূত্রে নিজের স্ত্রীর আত্মহননে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে সকলের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। যুগপৎভাবে এই ঘটনা তীব্রতর ক্ষোভ সঞ্চার করেছে দামিনীর জীবনবাদী মানসিকতায়। তাই তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ:

> "আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে।"
>
> ... "তোমরা দিনরাত 'রস রস' করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান। তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই! এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী তোমরা করিয়াছ।" (দামিনী ৬, *চতুরঙ্গ*)

লক্ষণীয় যে, এই প্রতিবাদের বস্তুপরিপ্রেক্ষিতটি ভিন্ন ঘটনার অনুষঙ্গে সৃজিত হলেও এর মধ্য দিয়ে দামিনীর নিজের জীবনের অবদমিত কান্নাই যেন জোরালোভাবে মুখরিত হয়ে ওঠে। ২৪ ও ২৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নিঃসঙ্গ প্রকৃতির ইমেজ ব্যবহার করে যে শিল্প-অভিব্যক্তিকে দ্যোতিত করা হয়েছে তা মূলত শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের মতো আধুনিক মানুষের অনিবার্য শূন্যতাবোধের চিহ্নায়ন। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য:

> ক্ষণকালের জন্য আমরা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিতেছে। (দামিনী ৫, *চতুরঙ্গ*)

Dhaka University Institutional Repository

বিষণ্ন প্রকৃতির এই বেদনাবিস্তার আর আধুনিক নির্বেদপ্রচ্ছাদিত জীবনকাঠামো এখানে সমীকৃত হয়ে গেছে। পরস্পরের প্রতি সংজ্ঞাপন-ছিন্ন এই অনুভূতি এক প্রেমহীন নির্বেদের অভিমুখে ধাবিত করেছে শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাসকে। শচীশ তার স্বোপার্জিত দার্শনিকতা কিংবা শ্রীবিলাস-দামিনী এক সামাজিক প্রেমসম্পর্কের আশ্রয়ে এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চাইলেও চূড়ান্ত ভাবে তারা এই নিঃসীম একাকিত্বকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ২৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে জীবনার্থের অন্বেষণে উদ্ভ্রান্ত শচীশের আবয়বিক বর্ণনায় আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংকট যেন আভাসে রূপায়িত। কেননা, শচীশের জীবনার্থ সন্ধানের পালাবদল ও তার পরিণতি-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য মীমাংসা অভিমুখী হয়েছে। শচীশ তার জীবন-নিরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে যে সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, যে ধ্বস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে তারই প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পে। ঝঞ্ঝাবিভগ্ন জাহাজের উপমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূলত শচীশের স্থিরতাশূন্য ক্রমবিবর্তিত জীবনপরিক্রমারই সংকেতায়ণ ঘটেছে। ২৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে দামিনী-শ্রীবিলাসের দাম্পত্য জীবনের সুখব্যঞ্জনা অনুরণিত। উভয়ের দাম্পত্যসম্পর্কের বীজ এক সীমাহীন দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে উদ্ভিন্ন হলেও ক্রমশ নিখাদ প্রেমবোধে তারা উজ্জীবিত হয়েছে। এরই অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে নগর কলকাতার নিসর্গ অনুভব। দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের অল্পদিনের বিবাহজীবন নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও চির-উজ্জ্বল অভিব্যক্তিকে ধারণ করেছে; ইট-কাঠের কলকাতায় বাস করেও তাদের হৃদয়ে গড়ে তুলেছে স্বর্গীয় কাননের আনন্দসৌধ[১]। তাই শ্রীবিলাসের অনুভব:

> কিন্তু, কলকাতার এই গলিতে এ কী হইল। ঘেষাঁ-ঘেষি ঐ বাড়িগুলো চারিদিকে যেন পারিজাত ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। (শ্রীবিলাস ৫, *চতুরঙ্গ*)

বিশেষত দামিনী আমৃত্যু হৃদয়ের গভীরে শচীশের জন্য অন্তহীন ভালোবাসা বহন করে গেলেও শ্রীবিলাসের প্রেমকে উপেক্ষা করতে পারেনি। ফলে শ্রীবিলাস আর দামিনী যেন নরনারীর এক ব্যতিক্রমী প্রেমসম্পর্ককে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে। এ কারণেই ২৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নৃত্যের অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শ্রীবিলাসের মনোচেতনার এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে।

---

[১] প্রসঙ্গত, *গোরা* উপন্যাসে ব্যবহৃত কলকাতা শহরের বর্ণনা স্মরণযোগ্য:

> বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। (পরিচ্ছেদ ২)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ভিন্নতর কৌশলে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার উপনিবেশিত জীবনকাঠামোর নির্জীবতাকে কুণ্ডলায়িত কুকুরের প্যারাডাইমে উপস্থাপন করতে আগ্রহী। আর এরই মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরার আলোড়ন-সঞ্চারী আবির্ভাবের বস্তু পরিপ্রেক্ষিত সৃজন করেন তিনি। গোরার অনিবার্য আবির্ভাবের বিপ্রতীপ সংকেত প্রদানের মতোই *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে শ্রীবিলাস-দামিনীর স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণতা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কলকাতা নগরের বিশুষ্ক চিত্রবর্ণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

[চ] ঘরে-বাইরে

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মূলত পরিবর্তমান ও সংকটাপন্ন দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের আত্মভাষ্যে তাদের জীবন-জটিলতাকে রূপায়িত করতে আগ্রহী ছিলেন। নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের ত্রিভুজ মনোসম্পর্ককে বিচিত্র মাত্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। উপমা উপ-তালিকার ৪৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিমলা-নিখিলেশের দাম্পত্যজীবনের আপাতদৃঢ়তার কূটাভাসে তাই ব্যবহৃত হয়েছে শুকতারার মতো উজ্জ্বল সিঁদুরের উপমান। উপন্যাসের সূচনাতেই বিমলার এই মূল্যায়ন যেন সন্দীপের সঙ্গে আসন্ন বিবাহ-অতিরেক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারই বিদ্রূপাত্মক পূর্বাভাস। এরই সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায় ৫০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। *নৌকাডুবি* উপন্যাসে রমেশ-কমলার ছদ্ম-দাম্পত্যসংসার যেমন সরল পদ্যের সঙ্গে উপমিত হয়েছিল, তেমনি এই উপন্যাসেও বিমলা-নিখিলেশের সম্পর্কের চিহ্নায়নে ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা সৃজনের অনুষঙ্গ। কিন্তু রমেশ-কমলা আর নিখিলেশ-বিমলার বন্ধন অভিন্ন মাত্রিক নয়। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে আত্মকথা বর্ণনার কৌশলে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে নিখিলেশ-বিমলার ভেদচিহ্নিত বিবাহসম্পর্ককে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে এসেছে কাব্যিক যতি, ছন্দশাসিত মূর্চ্ছনার চিহ্নায়ক। কবিতার যতি ছন্দ সকলকিছু থেকেও কখনো যেমন উপযুক্ত ভাবের অভাবে সমন্বিত হতে পারে না, তেমনি নিখিলেশ-বিমলার পারস্পরিক সংজ্ঞাপনের অভাবে তাদের দাম্পত্যজীবনের সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর প্রমাণ নিহিত রয়েছে ৫১, ৫২ ও ৫৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সন্দীপের অনিবার আকর্ষণ কীভাবে বিমলার কাছে দাম্পত্যবন্ধনের চেয়েও অমোঘ হয়ে উঠল, তারই শিল্পরূপায়ণ এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষণিকের জন্য হলেও সন্দীপের মাঝে বিমলা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল আত্মপরিচয়। নিখিলেশের কাছে তার যে প্রত্যাশা ছিল, সেই হার্দ্য অনুভব সে খুঁজে পায় সন্দীপের আকর্ষণের উদগ্রতায়। তাই যেন নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই নিজেকে এক বিশ্বব্যাপ্ত লোভের কাছে সমর্পণ করেছিল বিমলা। অপরদিকে, বিমলা ও সন্দীপের সমাজ-নিষিদ্ধ এই সম্পর্ককে অনুধাবন করতে নিরাসক্ত নিখিলেশের খুব একটা সময়ের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু কোনো এক স্বতন্ত্র রুচিবোধে নিখিলেশ নীরবে পর্যবেক্ষণ করে গেছে সন্দীপের উদ্দাম প্রেমাকর্ষণ, বিমলার ধারাবাহিক আত্মনিমজ্জন— আর এরই সমান্তরালে আন্দোলনমুখর ভারতবর্ষের নানাবিধ অন্ধকার দিক। নিখিলেশ সবকিছু উপলব্ধি করেও সন্দীপকে ত্যাগ করেনি, বরং জীবনের অনিবার্য অংশের মতো আপন জীবনধারায় স্থান দিয়েছে। এরই রূপক অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় ৫৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। বহুবর্ণিল পরগাছার রূপক আভাসে যেন সন্দীপের অবস্থানই চিহ্নায়িত। সন্দীপ যেমন বাচনিক আকর্ষণের অন্তরালে পরনির্ভর জৈবলোভ আর অর্থপিপাসা লুকিয়ে রাখে, তেমনি এই বহুবর্ণ উদ্ভিদের মধ্যেও লুকিয়ে আছে পরগাছার অমোচনীয় বৈশিষ্ট্য; তাই অপ্রয়োজনের বৈশিষ্ট্যে উভয়ই যেন সমীকৃত হয়ে যায়। এরই সমান্তরালে উপন্যাসে ক্রমঘনীভূত হয়েছে বিমলার দ্বান্দ্বিক জীবনপরিক্রমা; সন্দীপের প্রতি অদম্য আকর্ষণ আর নিখিলেশের প্রতি এক নৈতিক দায়বদ্ধতা— এই দুইয়ের দোলাচলে তার জীবন হয়ে ওঠে সংক্ষুব্ধ। কিন্তু নিখিলেশ স্বভাব-মানবতাবাদী হয়েও বিমলার মনোবিচ্যুতিকে অনুধাবনে কোনো হার্দ্য মানুষিকবোধ সক্রিয় করে না। তাই বিমলা তার কাছে উন্মোচিত হয় এক আবেগসংগুপ্ত বস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। এ কারণেই ৫৬ সংখ্যক উপমা-দৃষ্টান্তে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

ফটোগ্রাফের প্লেটের উপমান, যা বস্তুগুণে ধারণ করে প্রকৃতকে কিন্তু মূল্যায়ন করে না তার প্রাণ-প্রকৃতিকে। নিখিলেশের এ সহজাত নিষ্ক্রিয়তার বিপরীতে সন্দীপ অদ্ভুত প্রাণাবেগে উচ্চকিত। তার বহির্মুখী মানসিকতায় সে নিজের প্রয়োজনে অন্যায়কেও ন্যায় করে নিতে দ্বিধা করে না। তাই নিখিলেশের এই নীরবতা তার কাছে দুর্বলতারই প্রতিরূপ। নিখিলেশের পরম আদর্শচেতনা উপমা উপ-তালিকার ৫৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সন্দীপের দৃষ্টিকোণে উপমিত হয়েছে লোক-পুরাণাশ্রিত চাঁদ সওদাগরের কথকতায়। এর অন্তরালে একদিকে নিখিলেশের আদর্শচেতনা, বিশ্বাস এবং একটি অন্যনিরপেক্ষ আসক্তিবিহীন মনোপরিচয় যেমন প্রকাশিত তেমনি সন্দীপের আপেক্ষিক ন্যায়-অন্যায়চেতনা, নিজস্ব স্বার্থসচেতনতা এবং কখনো-কখনো তার সর্পিল বহিঃপ্রকাশ বিশেষ ভাষাকাঠামোয় আলোচ্য দৃষ্টান্তে চিহ্নায়িত হয়েছে। নিখিলেশের এ নিরাসক্তি কিংবা সন্দীপের নিজস্ব নীতিবোধের উদ্দীপনা বিমলাকে ক্রমশ আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত করেছে। এরই শিল্পরূপ প্রতিভাত হয়েছে উপমা উপ-তালিকার ৫৮ ও ৫৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। স্বামীর প্রেমশূন্য দৃষ্টি গ্লানিদগ্ধ বিমলাকে মরুতৃষ্ণায় কাতর করেছে। আবার আত্মসমীক্ষায় সে নিজের দোদুল্যমান অস্তিত্বকে চিহ্নায়িত করেছে প্রচল চিহ্নায়ক পদ্মপাতার শিশির বিন্দুর সাহায্যে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের সৃজন-শ্রেষ্ঠত্ব গুণে এই প্রচলিত প্যারাডাইমও অর্জন করে নিয়েছে বহুস্বরিক শিল্প-আবেদন। বিমলার এই কাতরতার মাধ্যমেই তার উপলব্ধির জগতে সংঘঠিত হয়েছে এক মূলসঞ্চারী আলোড়ন, পুনর্জাগরিত অনুভবে সে ফিরে এসেছে নিখিলেশের মনোজগতের কক্ষপথে। এ কারণেই নিখিলেশের নিরাসক্ত চোখও এক পর্যায়ে নতুনরূপে আবিষ্কার করেছে বিমলাকে। 'প্রভাতের আলোয় আচ্ছাদিত সকালবেলার চাঁদের' যে উপমান ৬০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিখিলেশের দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হলেও এর মধ্য দিয়েই বিমলার জীবনে সন্দীপের আগমনসূত্রে ফিকে চাঁদের অস্পষ্ট আলো-আঁধারির ব্যঞ্জনা যেমন রূপায়িত, তেমনি চূড়ান্তভাবে আসন্ন এক নবীন প্রভাতের আভাময় ইঙ্গিতও এতে বিদ্যমান। এভাবেই রূপায়িত হয়েছে বিমলার মনোবিশ্বের জটিল টানাপোড়েন— যা আলোচ্য উপন্যাসের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সর্বাধিক দ্বান্দ্বিক প্রান্ত।

চিত্রকল্প উপ-তালিকায় বিন্যস্ত ২৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে নিখিলেশ সর্বপ্রথম সন্দীপকে নিয়ে তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের ভাবি-সংকটকে সূক্ষ্মসূত্রে উপলব্ধি করতে পেরেছে। 'সকালবেলার' প্রেক্ষাপটে 'কালো' আর 'পূর্ণচাঁদের' রূপকতায় নিখিলেশের সামনে ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে তার 'কবিতার মতো' দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা। কেননা, সন্দীপের আগমন এক অন্ধকার ভবিষ্যতের মানবিক দ্বন্দ্ব-জটিলতাকে যেমন সম্প্রসারিত করেছে তেমনি বিমলার আকস্মিক উদ্ভ্রান্ত মনোবিশ্বও এর মধ্য দিয়ে শিল্প অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। বিমলার এ ক্ষণকালীন আত্মনিয়ন্ত্রণশূন্য জীবনের উৎস নিহিত ছিল সন্দীপের সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের মধ্যে। নিখিলেশের নিষ্প্রাণ সংগুপ্ত প্রেমের বিপরীতে সন্দীপের নিজস্ব নীতিবোধে উদ্দীপিত আকর্ষণ বিমলাকে, নিজের কাছেই নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রেরণার সংরূপ বিমলা যেমন অনুভব করেছিল, তেমনি উপলব্ধি করেছিল সন্দীপ। এরই প্রমাণ বিধৃত হয়েছে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৩০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সন্দীপের চোখে ধরা পড়েছিল বিমলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ, নির্ঝরিনী প্রতিম প্রাণপ্রাচুর্য; যা নিখিলেশের হৃদয়ের ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা দেয়নি। কিন্তু সন্দীপের চোখে নিজেকে আবিষ্কার করবার এই পরিতৃপ্তি বিমলার জীবনে স্থায়ী হয়নি। তাই পরিণতিতে বিমলা অপরিসীম মনোদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত; সন্দীপের মোহাবেশ, স্বার্থসচেতন

Dhaka University Institutional Repository

মনোভঙ্গি, জৈবক্ষুধা— সবকিছুই সূক্ষ্ম যুক্তিসূত্রে তার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট। ফলে, গ্লানিময় প্রেমানুভূতি তাকে এক জটিল ও সমাধানহীন সংকটে নিপতিত করেছে। বিমলার এই পীড়িত অস্তিত্বকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৩২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। সাপের সঞ্জননী শক্তির আশ্রয়ে বিমলার যে সক্রিয়তা, উদ্দাম মনোচেতনাকে আলোচ্য চিত্রকল্পে উপস্থাপন করা হয়েছে— তার পুরোটাই সন্দীপের সূত্রে পাওয়া। কিন্তু সন্দীপের এই মোহাবেশকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে শনাক্ত করেছে বিমলা, যা তার চিন্তার জগৎকেও নতুন বোধ ও বিশ্বাসে পুনর্বিন্যাস করেছে। ৩৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সীমাহীন সংকটের মাঝে পুনর্জাগরিত বিমলা আপন হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন আলোকিত প্রভাতের প্রত্যাশা করেছে। এক্ষেত্রে তার বিমুক্ত হৃদয়াবেগের নিজস্বতার প্রমাণ বহন করছে ডানা মেলা পাখির প্রতিমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুঃসময়' কবিতায় যেমন বিশ্বজাগতিক সংকটকে অতিক্রমের আশবাদ ব্যক্ত করেছিলেন পাখির ডানার ইমেজ সৃজন করে, সেই শিল্পানুভবের অনুরণনই যেন আলোচ্য দৃষ্টান্তে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত, বিমলাকে আশ্রয় করে বিবেকবিদ্ধ উন্মুলিত আধুনিক মানুষের বহুস্তরিক হৃদয়তল উন্মোচন ও চিরায়ত নৈঃসঙ্গ্যের মূল সুর অনুধাবনে এ চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

[ছ] যোগাযোগ

উপনিবেশিত ভারতবর্ষের উদীয়মান বণিকতন্ত্রের প্রতিভূ মধুসূদনের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রতিনিধি বিপ্রদাস ও তার বোন কুমুদিনীর শ্রেণীদ্বন্দ্ব বৈবাহিক সম্পর্কসূত্রে কীরূপে অমীমাংসিত ব্যক্তিস্বরূপের সংকটে পরিণত হল তারই শিল্পরূপ *যোগাযোগ* উপন্যাস। উপমা উপ-তালিকার ৬১ থেকে ৭৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে এই ব্যক্তিত্ব সংকটের স্বরূপ, তার বিবর্তন ও পরিণতি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাস থেকে নির্বাচিত প্রথম দৃষ্টান্তে প্রদীপ জ্বালবার পূর্বপ্রস্তুতির উপমান প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পাঠকৃতির গঠন ও বিন্যাসেকেই ভিন্ন রীতিতে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। বলা যেতে পারে, এই উপন্যাসের সংগঠন যে কাঠামোকে আশ্রয় করে নির্মিত, তার চিহ্নায়নে এই দৃষ্টান্তের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ৬২ সংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদীর্ঘকাললালিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্রবৃত্তিই এই পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় সংকট সৃজনের প্রধানতম শক্তি। এই উপন্যাসে এমন এক জীবনস্বরূপের হয়ে-ওঠাকে লেখক রূপায়ণ করেছেন, যে জীবনের একদিকে বাণিজ্যপুঁজি আর সুদীর্ঘ সামন্ত ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব বহুমাত্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে, অপরদিকে রুচি বিশ্বাস আর সংস্কারের দোলাচলে ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের সংজ্ঞাপন-ছিন্ন সংঘাত নিবিড়ভাবে সক্রিয় থেকেছে। এরই সমর্থন লক্ষ করা যায় ৬৩ এবং ৬৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। কুমুদিনী বিপ্রদাসের বাবা মুকুন্দলাল কীভাবে সপরিবারে ক্রমশ বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ক্রমক্ষয়িষ্ণু হয়ে এক পর্যায়ে বিলীন হতে বাধ্য হলেন, তারই শৈল্পিক নির্দেশনা বিধ্বস্ত জাহাজের চিহ্নায়কে নির্দেশিত হয়েছে। নগর কলকাতার রুদ্ধ জীবনে বীতক্ষম বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর অনুভবও জান্তব উপমানের প্রয়োগে বিন্যাস করেছেন এই উপন্যাসে। বলা যায় যে, ভগ্ন সামন্ত-ঐতিহ্যের সর্বশেষ প্রতিনিধি বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকারণসিদ্ধ ও নান্দনিক করে উপস্থাপনের জন্যই উপন্যাসের প্রারম্ভে লেখক অতীত ঘটনার চিহ্নায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। আবার এর বিপ্রতীপে বণিকতন্ত্রের প্রতিনিধি মধুসূদনের বিশেষত্ব নির্দেশিত জীবন ও মানসিকতাকেও উপন্যাসে সুবিন্যস্ত করেছেন তিনি। উপমা উপ-তালিকার ৬৫, ৬৭, ৬৮ এবং ৭২ থেকে ৭৪ সংখ্যক দৃষ্টান্ত মূলত প্রাক্-ক্যাপিটালিস্ট মধুসূদন, তার জীবনবোধ মানসিকতা এবং যে সমাজে সে বাস করে তার বস্তুপরিপ্রেক্ষিতের চিহ্নায়নকে শিল্পিত করে তুলেছে। উপন্যাসে সতর্ক ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে অকরুণ শব্দসম্ভারে মধুসূদনের দৈহিক বিবরণ দান করেছেন তার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্বকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এরই সম্প্রসারিত রূপ লক্ষ করা যায় তার চরিত্রের সঙ্গে চাঁদের অন্ধকার পৃষ্ঠের তুলনায় কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থের ব্যাঘাতে সিংহী-প্রতিম হিংস্রতার অনুষঙ্গের প্রয়োগে। বিশেষত মধুসূদনের অমানুষিক কর্মকুশলতা আর অমানবিক চেতনাজগতের যে ব্যবধান তাকেই যেন চাঁদের আলো-আঁধারির বৈপরীত্যে রূপায়ণ করা হয়েছে। এই বিপ্রতীপতার শিল্প-কৌশল ব্যবহার করে তার মানসিকতার চিত্রনকে নান্দনিক করে তুলেছে ভিক্ষুকের মাথায় জরির তাজের ইমেজ। মধুসূদনের প্রাচুর্য যে তাকে কোনো সমন্বিত রুচিবোধে উন্নীত করতে পারেনি তারই বিদ্রূপাভাস যেন ধ্বনিত হয়েছে এই দৃষ্টান্তে। একইভাবে, রুচিশীলা কুমুদিনীর মানসিক প্রত্যাখ্যান মধুসূদনকে যে স্থূল ক্ষোভে উপন্যাসের আদ্যন্ত দগ্ধ করেছে তার ইঙ্গিত শিল্পিত হয়ে ওঠে ৭২ ও ৭৩ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। এর বিপরীতে মধুসূদনের প্রতি কুমুদিনীর ভালবাসাবিহীন ভীতিকর অনুভবকেও রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম কৌশলে চিহ্নায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> ও [মোতির মা] যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে— যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। (পরিচ্ছেদ ২৩, *যোগাযোগ*)

মধুসূদনের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি আর মানসিক স্থূলতাকে আরও বেশি ঘনীভূত করে তুলতে এর সমান্তরালে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের সৌম্য-ব্যক্তিত্ব ও শ্রেণী-আভিজাত্য। ঋণভারগ্রস্ত বিপ্রদাস আপন ব্যক্তিত্বকে অস্তিত্বের অংশ করে তুলেছে। এরই শিল্প-আভাস উপমা উপ-তালিকার ৬৬, ৬৯ এবং ৭৫ সংখ্যক দৃষ্টান্ত। শতচ্ছিন্ন অন্তর্জগৎ এবং প্রগাঢ় ট্রাজিক বেদনায় বিপন্ন ও নিঃসঙ্গ বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও সংক্ষোভকে রূপায়ণের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। *মহাভারতের* ভীষ্মের প্রসঙ্গের অবতারণায় বিপ্রদাসের অনমনীয় ও আপোষহীন প্রতিজ্ঞা, তার ঐতিহ্যিক রুচিবোধ এবং ত্যাগ ও সংযমের বিশেষত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে, কুমুর অসফল বঞ্চনাময় দাম্পত্যজীবন বিপ্রদাসের অন্তঃকরণে যে সুতীব্র ঘৃণা আর ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে তারই শিল্পরূপায়ণে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের প্যারাডাইম। বস্তুত, এক অপরিসীম মমতায় রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বিপ্রদাসের মনোগত বেদনাকে সুগভীর আবেদনে চিহ্নায়িত করতে পূর্বাপর সচেষ্ট থেকেছেন। একইসঙ্গে, বিপ্রদাস চরিত্রের এই মহত্বপূর্ণ বিন্যাস পরোক্ষভাবে মধুসূদনের বৈভবের অন্তঃসারশূন্যতাকে যেমন চিহ্নায়িত করেছে, তেমনি কুমুদিনীর উপর তার দাদার অমোচনীয় প্রভাব কুমুদিনী-মধুসূদনের দাম্পত্য সম্পর্ককেও অধিকতর সংকটাপন্ন করে

Dhaka University Institutional Repository

তুলেছে। বিপ্রদাসের মতো কুমুদিনীও সামন্ত ঐতিহ্যকে আপন হৃদয়ের কেন্দ্রে অপরিসীম মমতায় লালন করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার দৈবনির্ভর সংস্কারচেতনা। নিয়তিতাড়িত জীবনার্থের প্রতি অবিচল আস্থা তাকে মধুসূদনের বাণিজ্যপুঁজি নির্মিত পরিবারকাঠামোতে কোনোভাবেই অভিযোজিত হতে দেয়নি। সমাজের অনুশাসন মেনে মধুসূদনের সন্তানকে আপন গর্ভে ধারণ করেও এক অনড় উপলব্ধিতে সে নিজেকে মধুসূদনের কারাগারে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছে। এভাবে সমাজ পরিবর্তনের সংকট আধুনিক ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে বহুমাত্রিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই আখ্যান কালসত্য ও যুগসত্যকে সমাজসত্যে পরিণতিমুখী করেছে।

উপন্যাসের চিত্রকল্প সৃজনেও রবীন্দ্রনাথ তার আকল্পলালিত বোধ ও প্রতিপাদ্যকে পূর্বাপর সুনিপুণভাবে বিন্যাস করেছেন। বিশেষত কুমুদিনী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক নান্দনিক শ্রেষ্ঠত্বে সৃজন করেন ব্যতিক্রমী প্যারাডাইমের অভূতপূর্ব সিনট্যাগম্যাটিক সজ্জা। প্রসঙ্গত, চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৩৪, ৩৫ এবং ৩৬ সংখ্যক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কুমুদিনীর মনোজগতের স্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন 'ভোরের শুকতারার' উপমান[১]। শুকতারা তথা শুক্রগ্রহের দৈনিক সম্প্রকাশকাল আকাশের আর সকলকিছু থেকে পৃথক। রাতের শেষ প্রহরে আকাশের সব তারা যখন দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতে থাকে তখনই এক অনন্য অবয়বে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে এই শুকতারা। আবার ভোরের প্রকাশে সে পুনরায় দৃষ্টির অন্তরালে মিলিয়ে যায়। শুকতারার এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কুমুর স্বতন্ত্র জীবনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমাপতিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সামন্ততন্ত্রের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে আত্মস্থ করে বাণিজ্যপুঁজির বিষবাষ্প থেকে মুক্ত হয়ে স্বসৃষ্ট এক জগতে নিজেকে বিন্যাস করেছে কুমুদিনী। অভিন্ন প্রবণতায় কলকাতার বিমর্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপমান প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কুমুর বিধ্বস্ত দাম্পত্য জীবনের এক মর্মস্পর্শী চিত্রকাল্পিক আবেদন সঞ্চারিত হয়েছে ৩৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। ৩৬ সংখ্যক দৃষ্টান্তে এই বেদনাদগ্ধ অনুভবকেই 'অজগরের ক্লেদাক্ত জঠরে রুদ্ধ' হওয়া তথা গলাধকরণের অনুষঙ্গে নতুন মাত্রা প্রদান করা হয়েছে। আর এরই মধ্য দিয়ে সমগ্র উপন্যাসে কুমুদিনীর মনোপটকে নান্দনিক স্বতন্ত্র্যে নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক। চিত্রকল্প সৃজনে কুমুদিনী প্রধান্য পেলেও উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ও প্রসঙ্গের উপস্থাপনায়ও রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ চিত্রকাল্পিক পরিচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন *যোগাযোগে*।

[জ] শেষের কবিতা

শেষের কবিতা, কবিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের নতুনতর জীবনার্থসন্ধানের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ। সসীম মানবিক প্রেমাবেগের সীমাহীন মুক্তানুভূতি অন্বেষণের নান্দনিকতায় উপন্যাসটির আকরণ সুবিন্যস্ত। পেয়ে হারানোর বেদনাকে না পাওয়ার মহিমান্বিত অনুভবের বিশালতার মধ্যে বিমণ্ডিত করে অমিত ও লাবণ্য আপাতভাবে মীমাংসিত হতে চেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃজন কৌশলে উভয়ের কেউই সাধারণ রুচি

[১] প্রসঙ্গত স্মরণীয় *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে বিমলার আত্মকথায় শুকতারার মতো উজ্জ্বল সিঁদুরের কূটাভাস।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা মানসিকতায় গড়া নরনারী নয়। তাই অমিত বহুনারীর মধ্যেও তার আকাঙ্ক্ষিত নারী প্রতিমাকে অন্বেষণ করে বেড়ায়। সমাজের প্রাগ্রসর শ্রেণীর মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও 'সোনার দিগন্তরেখার' মতো সবচেয়ে কাছের হয়েও সবচেয়ে দূরের থেকে যায়। এরই সমর্থন লক্ষ করা যায় উপমা উপ-তালিকার ৭৭ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। অমিতর এই অধরা মন, যা নিগূঢ় রোমান্টিকতায় পূর্বাপর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত, সেই মনোজাগতিক প্রেরণা তার ঈপ্সিতা নারীকেই অন্বেষণ করে চলে। প্রসঙ্গত, লক্ষণীয়:

> রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চরিত্ররা শব্দকেই একটি মৌল মূল্যবোধরূপে আশ্রয় করেছে, এবং তাদের ভাষ্য কাব্য বা poetic diction। ভাষাশিল্পী এই চরিত্রগুলি অনেক সময় বাক্‌পটুতায় যুক্তির (resaon) পরিবর্তে ওজর (rationalization) পরিচয় দিয়েছে। অমিত রায় এই শ্রেণীরই পুরোধা। (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত; ১৪৯: ১৯৬৯)

এ কারণেই প্রসাধিত বাহ্যিক রূপমাধুরী অমিতর অন্বিষ্ট নয়; বরং সে খুঁজে ফেরে নারীর অন্তরের অপরিসীম সৌন্দর্য। উপমা উপ-তালিকার ৭৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সেই বিমূর্ত রূপের আলো নিয়েই লাবণ্য আকৃষ্ট করে অমিতকে। স্বচ্ছ, বুদ্ধিদীপ্ত গভীরতাসঞ্চারী হৃদয়ানুভবে লাবণ্য আর অমিত একে অন্যের সঙ্গে গড়েছে মুক্তির মেলবন্ধন। লাবণ্যের সঙ্গে অকস্মাৎ-সৃজিত এই সম্পর্কের মধ্যে অমিত খুঁজে পেয়েছে বর্ষা-বর্ণিল শিলঙ পাহাড়ের অকৃত্রিম সৌন্দর্যের সাদৃশ্য। উপমা উপ-তালিকার ৮০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে অমিতর এই অনন্য প্রেমানুভূতিই শিল্পভাষ্যে রূপায়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমিত-লাবণ্য কোনো অতি-সংবেদনশীল মনোপ্রাবল্যে বিমূর্ত প্রেমকে শেষ পর্যন্ত মূর্ত করে না। উপমা উপ-তালিকার ৭৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তে অভিব্যক্ত যে প্রেম, উভয়কে নতুন দর্শন দিয়েছিল যে প্রেমের অভিপ্রকাশে অমিত খুঁজে পেয়েছিল 'সিন্ধুপারগামী পাখির' দৈব আহ্বান, সে প্রেমকে দুজনের কেউই প্রাত্যহিকতায় মলিন করতে চায়নি। তাই অমিত ফিরে যায় কেতকীর কাছে, লাবণ্য নির্বাচন করে শোভনলালকে। কেবল এক অত্যুচ্চ রোম্যান্টিক স্মৃতিবিহ্বলতাকে হৃদয়ের সুগভীরে সযত্নে লালন করে চলে অমিত-লাবণ্য। একইসঙ্গে, অমিত-লাবণ্যের মনোসম্পর্কের আপাত মীমাংসার মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা বিদ্যমান তাকেও ঔপন্যাসিক সুচিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি। এরই প্রমাণ লক্ষ করা যায় নিচের দৃষ্টান্তে:

> এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে, আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। (পরিচ্ছেদ ৫, *শেষের কবিতা*)

ভারতীয় মিথকথার অন্তর্গত ত্রিশঙ্কুর ইমেজে অমিতর মনোজগতের যে অনুপুঙ্খ উপস্থাপন এই দৃষ্টান্তে সুব্যাপ্ত তা উপন্যাসটির নান্দনিক সাফল্যকে অধিকতর প্রসারিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেষের কবিতা উপন্যাসের চিত্রকল্প সৃজনেও রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্নভাবে এক অত্যুচ্চ রোমান্টিকবোধে সক্রিয় থেকেছেন। চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৩৮ সংখ্যক দৃষ্টান্তে অমিত এই বোধের অন্বেষণেই কলকাতার মেকি আর আড়ম্বরের জগৎ থেকে পালিয়ে যেতে চায়, যাবতীয় কৃত্রিমতার শৃঙ্খল ভাঙতে নাগরিক জীবন থেকে সে সরে আসতে চায় কোনো অনির্দেশ্য ব্যবধানে। লাবণ্যের সঙ্গে অমিতর আকস্মিকভাবেই গড়ে ওঠে আবেগ-গভীর সমানুভূতির সম্বন্ধ। উভয়ের এই ব্যতিক্রমী মনোসংবেদনা চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৩৯ এবং ৪০ সংখ্যক দৃষ্টান্তে বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নায়িত। দৃষ্টান্তদ্বয়ে সায়াহ্নের মায়াময় নিসর্গের আবেশে অমিত ও লাবণ্য যেন নিজেদের নির্বস্তুক প্রেমস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। একইসঙ্গে, রাতের আগমনে প্রস্ফুটিত ফুলের ম্রিয়মাণ হওয়ার ঘটনা তাদের এই প্রেমসম্পর্কের পরিণতিরই আভাস দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণিকের এই প্রেম অমিত ও লাবণ্যকে সন্ধান দেয় এক অসীমতাসঞ্চারী আনন্দের— যেখানে সায়াহ্নের প্রকৃতি আর লাবণ্য একীভূত হয়ে যায়, অমিতর তৃষিত আত্মা প্রাত্যহিকতা উত্তীর্ণ এক চিরন্তন স্বর্গলোকের সন্ধান পায়। রবীন্দ্রনাথ যেন একটি নিটোল গীতিকবিতার বিহ্বল কবিহৃদয়কেই কখনো অমিত, কখনো লাবণ্যর মধ্যে অভিক্ষিপ্ত করে তাঁর উদ্দিষ্ট শিল্প-রসকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। কিন্তু, ঔপন্যাসিককে শেষপর্যন্ত বাস্তবের কাছেই ফিরে আসতে হয়। এই অমোচনীয় বাস্তবতাকেই রূপায়ণ করা হয়েছে চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৪১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে। 'দীঘি' আর 'ঘড়ায় তোলা জলের' যে উপমান লেখক আলোচ্য চিত্রকল্পে ব্যবহার করেছেন তা মূলত এই অনিবার্য বাস্তবতার চিহ্নায়নকেই সহযোজিত করে।

শেষের কবিতা উপন্যাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্ত এর কবিতাংশসমূহ। বিশেষত, উপন্যাসের শেষে সংকলিত কবিতা মূলত চিরায়ত ও অনন্য প্রেমসম্পর্ককেই নতুন মাত্রায় চিহ্নায়িত করে। তাই উপমা-চিত্রকল্পের অসামান্য সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় ধারণ করতে চেয়েছেন তার কবিহৃদয়ের অতিসংবেদনশীল প্রেমদর্শনকে। জীবনের দৈনন্দিনতায় না পাওয়ার মধ্যেও যে অত্যুচ্চ প্রেমানুভব চিরকাল অমলিন থেকে যায়, সেই সংবেদনাকেই রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যাংশে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছু রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়—
সে আমার প্রেম। (পরিচ্ছেদ ১৭, *শেষের কবিতা*)

Dhaka University Institutional Repository

তাই লাবণ্যকে প্রতিদিনের জীবনে বেঁধে ফেলা নয় কিংবা সে জীবনে নিজের বাঁধা পড়া নয়, বরং এক অলোকসামান্য প্রেমানুভূতিকে আজীবন বহন করার মধ্যেই অমিত খুঁজে পেয়েছে প্রেমের সার্থকতা। লাবণ্য আর অমিতর বিচ্ছেদই যেন এই প্রেমের পূর্নতার চিহ্নায়ক। এ করাণেই লাবণ্য হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করতে পারে:

তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়াছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়। (পরিচ্ছেদ ১৭, *শেষের কবিতা*)

এভাবেই হৃদয়ের অনির্বচনীয় অনুভবের স্বাতন্ত্র্যে *শেষের কবিতা* এক চিরকালীন প্রেমাভিব্যক্তির চিহ্নায়ন ঘটায়।

[ঝ] দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাস *দুইবোন*, *মালঞ্চ*, *চার অধ্যায়* এর শিল্পরূপায়ণে চরিত্রমনস্তত্ত্বের বহুলাঙ্গ অভিক্ষেপই মুখ্য। উপন্যাসগুলোতে আখ্যান যেন হয়ে উঠেছে পরিপ্রেক্ষিত। শূন্য-কাহিনীর মধ্যে কিছু দ্বান্দ্বিক বস্তুসমাবেশে পাঠকৃতি ধারণ করে আছে বিবিধ চরিত্রের বিকাশ-উন্মুখ গতিধারা। উপমা উপ-তালিকার ৮১ থেকে ৮৮ সংখ্যক এবং চিত্রকল্প উপ-তালিকার ৪২ থেকে ৪৯ সংখ্যক দৃষ্টান্তসমূহ কোনো পরস্পর স্বতন্ত্র আবেগকে চিহ্নায়িত করে না বরং আধুনিক নর-নারীর কর্মস্পৃহা, প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং সংগুপ্ত বেদনার অণুবিশ্বকে ধারণ করে। *দুই বোন* উপন্যাসে শর্মিলা-উর্মিমালার দ্বন্দ্ব কিংবা *মালঞ্চে* নীরজা-আদিত্য-সরলার মধ্যকার অনন্বয় কোনো বিশেষ উপন্যাস কিংবা বিশেষ আখ্যানে প্রাপ্ত কোনো চরিত্রপুঞ্জের সংকট নয় বরং তা প্রতীকী অবয়বে সামান্য দৃষ্টিকোণে বিপন্ন আধুনিক মানবকে চিহ্নায়িত করে। তাই এ সকল উপন্যাসে কাহিনী দানা বাঁধে না বরং বিচ্ছিন্ন প্রতীকের সহাবস্থানে এক বিমূঢ় শূন্যময় অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এর প্রকাশ হয়ে ওঠে ঋজু ও শিল্পসূক্ষ্ম। প্রসঙ্গত, *মালঞ্চ* উপন্যাস বিষয়ক মন্তব্য লক্ষ্যণীয়:

> চিত্র-অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ কত পরিমিত, অথচ রসব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কত সূক্ষ্ম তার প্রমাণ 'মালঞ্চে'র প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি চিত্রের মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শ একীভূত হয়ে আমাদের আবিষ্ট করে। (সৈয়দ আকরম হোসেন; ৩৬৭:১৯৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

এই মন্তব্যের সপ্রমাণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায় নিচের দৃষ্টান্তে:

> বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলা বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। (পরিচ্ছেদ ১, *মালঞ্চ*)

'ঝা ঝা রৌদ্রের' তীক্ষ্ণতার সঙ্গে 'ঢং ঢং ঘণ্টার' সাদৃশ্য সৃজনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরজার রুক্ষ মনের যে চিত্রায়ন সংঘটিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে শৈল্পিকতায় অনন্য। এই প্রবণতা *দুইবোন* কিংবা *চার অধ্যায়* উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষত *মালঞ্চ* উপন্যাসে শবদেহের ইমেজ ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় তা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-উপন্যাসের এক অনন্য সংযোজন।

> পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রঙ, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা। (পরিচ্ছেদ ১, *মালঞ্চ*)

মালঞ্চ-সহ এ পর্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপমান 'অনাবাদি ফসল', 'প্রজাপতি-মৌমাছি', 'বৈশাখের নদী', 'বাঁদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফল' প্রভৃতি কিংবা বিশুষ্ক নদী, ফিকে জ্যোৎস্না, সর্বনাশী চৈত্র প্রভৃতির ইমেজও প্রকৃতপক্ষে এক নির্বেদ কাল আকঁড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানবসভ্যতার দৈন্য অস্তিত্বকেই নান্দনিক সৌকর্যে উপস্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রতীক

রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতীক বিশিষ্ট মাত্রায় নির্দেশিত। রবীন্দ্র-কবিতা এবং নাটকে শিল্পোত্তীর্ণ প্রতীকের সার্থক ব্যবহার যেমন বহুল আলোচিত তেমনি নতুনতর বিশ্লেষণ সম্ভাবনায় অপেক্ষমান। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রতীক একটি স্বল্পচর্চিত প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভারে একাধিক শিল্পোত্তীর্ণ রূপক-সাংকেতিক নাটকের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও যে অর্থে একটি সমগ্র উপন্যাস প্রতীকী হয়ে ওঠে, সে জাতীয় কোনো রচনা রবীন্দ্র উপন্যাসে সুলভ নয়[১]। কিন্তু তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই বিবিধ নান্দনিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে বিচিত্র প্রতীকী অনুষঙ্গ। এ সকল প্রতীকী উপাদান রবীন্দ্র উপন্যাসকে করে তুলেছে অনেকান্তিক স্বরবিশিষ্ট, কালান্তরের বিবেচনায় নিয়ত আধুনিক। কেননা, প্রতীকের জন্ম এবং তার অন্তরালবর্তী সংহিতার তাৎপর্য অনুসন্ধান বিশেষ সময়ের বিশেষ সংস্কৃতির সীমায় সংঘটিত হয়। ফলে, কাল ব্যবধানে একই প্রতীক ভিন্ন দ্যোতনায় ব্যাখ্যাত হবার সামর্থ্য সংরক্ষণ করে। রবীন্দ্র উপন্যাসেও পূর্বাপর এই বহুপ্রতীকতার শৈল্পিক বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন উপন্যাস থেকে নির্বাচিত প্রতীকের আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতীক বিষয়ে একটি সংহত ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

ঝড় : প্রকৃতির বহুমাত্রিক ব্যবহার রবীন্দ্রসাহিত্যের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। আখ্যানের বস্তুপরিপ্রেক্ষিত সৃজন, মূল কাহিনীকাঠামোর বিন্যাস কিংবা বিকাশমান চরিত্র বা চরিত্রসমষ্টির নান্দনিক অভিপ্রকাশে প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গের সংকেতিত প্রয়োগ রবীন্দ্র উপন্যাসেও অমোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। উনিশ শতকে রচিত *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাস থেকেই প্রাকৃতিক অনুষঙ্গজাত সংহিতার উপস্থিতি পরিদৃষ্ট। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঝড়, তথা মেঘাবৃত বৃষ্টিবিহ্বল বর্ষাপ্রকৃতির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আচরণ। প্রায়শই এরূপ প্রকৃতিক বর্ণনা বহুস্বরের শিল্পময়তায় সমৃদ্ধ; কোনো বিশেষ প্রতীকতায় সুচিহ্নিত। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুম্‌দাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে।

---

[১] *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের কথা স্মরণে রেখেও এ মন্তব্য অযথার্থ নয়। কেননা, উপন্যাসের আবহ প্রতীকী হলেও এর কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য শেষপর্যন্ত প্রতীকের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন মন্তাত্ত্বিক আবেশ সঞ্চার করে।

Dhaka University Institutional Repository

> বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোট একটি মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। (একবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

ঝঞ্ঝা আন্দোলিত এই প্রকৃতির মালাবদ্ধ বিবিধ মাত্রা প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে বিধৃত বহু আখ্যানপ্রান্তের ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। প্রারম্ভ থেকেই এখানে মানবিকতা এবং পাশবিকতার যে দ্বন্দ্ব ক্রমবিস্তৃতি লাভ করেছে তারই যেন অশনিঘন পরিণতির পূর্বাভাস দেয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এরূপ প্রতীকী অনুষঙ্গের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সদ্য পত্নীবিয়োগের যন্ত্রণা এবং দুর্ভার একাকিত্ববোধের অন্তর্দেশে যে হার্দ্য আলোড়ন উদয়াদিত্যকে আমূল বেদনাবিদ্ধ করেছে, তারই সংহিতারূপ হয়ে পাঠকৃতিতে উঠে এসেছে ঝড়ের প্যারাডাইম। কিন্তু সুরমার মৃত্যু কেবল উদয়াদিত্যকে নিঃসঙ্গই করেনি, একইসঙ্গে এক ভয়াবহ শঙ্কা এবং নিরস্তিত্বের আগ্রাসন তাকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাই ঝড়ের তাণ্ডবে বিপন্ন পল্লীগ্রাম যেন বিধ্বস্তপ্রায় রাজকুমারের প্রতীকী মুখচ্ছবি। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত উদয়াদিত্য প্রকৃতপক্ষে সংকটদীর্ণ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ক্রমশ ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কেননা, পরবর্তী পরিচ্ছেদে রুক্মিণীর আগমন তাঁর জীবনকে যে নতুনভাবে সংক্ষুব্ধ করে তুলবে তার আভাসও এই বর্ণনায় শিল্পরূপপ্রাপ্ত। তবে, উদয়াদিত্যের সমাজবিচ্ছিন্ন বেদনাবিধুর পরিণতি উপন্যাসে চিত্রিত হলেও পিতা প্রতাপাদিত্যের বিমানবিক অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসার যে সামর্থ্য সে আপন ব্যক্তিত্বে ধারণ করেছে, তারও অস্পষ্ট ইঙ্গিত যেন এই অনুচ্ছেদে বিদ্যমান। এ কারণেই ঝড়ের উন্মত্ত আলোড়ন কেবল 'গ্রামপল্লীকে'ই বিধ্বস্ত করে না, একইসঙ্গে, রাজবাড়ির দরজাও 'দুমদাম' ভেঙে ফেলতে চায়। বস্তুত, উপন্যাসের পাঠকৃতিতে সংকটাপন্ন মনুষ্যত্বকে সমুন্নত রাখবার চিহ্নায়নই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় বহন করে চলেছে আলোচ্য ঝড়-প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসেও বিচিত্র মাত্রায় চিহ্নায়িত হয়েছে ঝড়-প্রতীক। *নৌকাডুবি* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কাহিনীকাঠামোই দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশেষ ঝঞ্ঝা-আপ্লুত পরিস্থিতিকে আশ্রয় করে। কমলা-রমেশ-হেমনলিনীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট যে বিশ্বাস, নীতিবোধ এবং প্রেমানুভূতির জটিল সংঘাতে ঘনীভূত হয়েছে, তার উৎসমূল নিহিত আছে ঝড়ের অনুষঙ্গে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা খড়কুটা, ধুলা-বালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে; 'রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল, হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল, কেহই জানিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল, তাহার কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। (পরিচ্ছেদ ২, *নৌকাডুবি*)

এই ঝড় যেন মানবের জন্মান্তরিত মনস্তত্ত্বের সংকেতবাহী; যা হেমনলিনী-রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষ সকলকে এক আন্দোলিত জীবনাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। আবার জীবনলব্ধ দর্শন— তার স্বয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিস্বয়কে সমন্বিত করবার জন্য অভিন্ন প্রতীক ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে। কর্মময় জীবন থেকে অধ্যাত্মবাদ এবং সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক সমীকৃত জীবনবোধ স্পর্শ করার যে নান্দনিক উপস্থাপনা উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় অবভাস তাকে শিল্পিত করে তুলতে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের অভিজ্ঞতালব্ধ ঝঞ্ঝাময় রাত্রির বর্ণনা বিশেষ সংকেতময়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরাসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিভিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুশলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানারকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। (শ্রীবিলাস ৪, *চতুরঙ্গ*)

শচীশ-দামিনীর অস্পষ্ট প্রণয়ের পূর্ণতার পূর্বাভাস প্রদানে উপর্যুক্ত ঝড়ের অনুষঙ্গ অত্যন্ত তাৎপর্যবহুল। বহুস্বরের সম্মিলনে এই ঝড়-প্রতীকের সূচনা ঘটেছে শচীশ কর্তৃক দামিনীকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যানের স্মারক 'আলো' নিভে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। একইসঙ্গে, বৃষ্টির তাণ্ডবনৃত্যে করতালের রূপকাভাস যেন দামিনীর আপাত প্রেমবিসর্জনের ইঙ্গিতবহ। তাই ঝড়ের সংক্ষোভ সমাপ্ত হতেই অত্যুচ্চ দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন শচীশের তিতিক্ষার প্রার্থনা দামিনীর হৃদয়কে করতালতুল্য আঘাতের অনুরণনে উচ্চকিত করে। এরই মধ্য দিয়ে দামিনী অনুভব করে এক মৃত্যু-শীতল অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা।

রক্ত : ঐতিহ্যিক ধর্মানুশাসন এবং অকৃত্রিম মানবিকতাবোধের যে দ্বান্দ্বিক চিহ্নায়ন রবীন্দ্রনাথের *রাজর্ষি* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়, তার শৈল্পিক বিবর্ধনে রক্ত অনুষঙ্গের প্রতীকী প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তপাত দেখবার প্রতিক্রিয়ায় বালিকা হাসির জ্বরবিকার এবং অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুর বলিপ্রথার প্রতি যে ঘৃণার সূত্রপাত, তা ক্রমান্বয়ে এক যুদ্ধ বিরোধী চিরকল্যাণকামী-আহ্বানে পরিণতিপ্রাপ্ত। এই শাশ্বত দর্শনের শৈল্পিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত হয়ে আছে রক্ত প্রতীকচিহ্ন। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

ক. এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল 'এত রক্ত কেন' যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

খ. রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেতপ্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

গ. এখানে কোনো দেবতা নাই, কোনো দেবতা নাই! পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে! (চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয়, রক্ত প্রতীকের উৎসমূলে ঘৃণার আবেশ সঞ্চারিত হলেও পাঠকৃতির বিন্যাস প্রক্রিয়ায় তা মূলত রাজ পুরোহিত রঘুপতির আত্মার আর্তনাদে বেদনার্দ্র। আপন ক্ষমতা এবং অহংপ্রতিষ্ঠায় যে ষড়যন্ত্রের উর্ণনাভ-জাল রঘুপতি ক্রমবিস্তার করেছিল তারই চক্রান্তে সন্তানতুল্য জয়সিংহের মৃত্যু তাকে এক অন্তহীন ট্রাজিক বেদনায় নিপতিত করেছে। এই বেদনার শিল্পরূপায়ণেও রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন রক্ত- প্রতীকের অনুষঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রতীকচিহ্নটি সমগ্র উপন্যাসের ভাববিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখে এর নান্দনিকতাকে বিশেষমাত্রায় সম্প্রসারিত করেছে।

নৌকা: রবীন্দ্র সাহিত্যে নৌকা-প্রতীকের প্রয়োগ বহুদৃষ্ট। *চোখের বালি* উপন্যাসে বিনোদিনীর প্রতি রূপজমোহ এবং উদ্ভ্রান্ত আবেগজাত আকর্ষণ মহেন্দ্রকে যে লক্ষহীন স্রোতে ভাসিয়েছিল তারই সমাপ্তি নির্দেশনার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে নৌকার অনুষঙ্গ। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল— মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ তাহার মুখ দিয়া তথা বাহির হইল না। (পরিচ্ছেদ ৫১)

বিহারীর প্রতি মনোসমর্পিতা বিনোদিনীকে নিজস্ব অধিকারের অংশ করে তুলতে অজ্ঞানমোহে মহেন্দ্র আপন পরিবার তথা মাতা, স্ত্রী, আবাল্য সুহৃদ সকলকে ত্যাগ করেছে। এই বিবেকহীন ভালোবাসাবিহীন উন্মত্ত আচরণ সত্ত্বেও মহেন্দ্র কখনোই বিনোদিনীর প্রকৃত শ্রদ্ধা কিংবা প্রণয়ের আস্বাদ পায়নি। যে মানুষিক ঈর্ষাবোধে তাড়িত হয়ে সে আশা-মহেন্দ্রর দাম্পত্যজীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল, তাতে মহেন্দ্রর উন্মার্গগামিতার ভূমিকাও স্বল্প ছিল না। বিহারীর প্রতি বিনেদিনীর শ্রদ্ধাবোধ উন্মোচিত হয়ে উঠতেই মহেন্দ্রর নীতি-অস্থির রুচিদুর্বল মন যে আকস্মিক আঘাত পেয়েছিল তা-ই মূলত চিহ্নায়িত হয়েছে চড়ায় আটকানো নৌকার রূপকল্পে।

নৌকাডুবি উপন্যাসে নৌকার শিল্পরূপায়ণ ঘটেছে ভিন্নতর অনুষঙ্গে। দৈবদুর্বিপাকে রমেশ-কমলার বিবাহবিহীন ছদ্ম দাম্পত্যজীবনে কমলার নৈঃসঙ্গ্য-অনুভূতি এবং ক্রমশ নাস্তিত্বে অভিগমনের চিহ্নায়নে ব্যবহৃত হয়েছে নৌকার সঙ্গে প্রতিতুল্য ডিঙি প্রতীক। প্রসঙ্গত:

> নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটিমাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালী সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল। (পরিচ্ছেদ ২৫)

নৌকার পরিবর্তে ডিঙির ব্যবহার যেন কমলার সংকুচিত অস্তিত্ব এবং অসহায়ত্বেরই সংকেতবাহী। রমেশের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে, আপন সংস্কার ও নীতিবোধ তাকে একদিকে অপরিসীম কলুষভাবনায় আপ্লুত করেছে, অপরদিকে সুকঠিন অস্তিত্ব সংকট তার জীবনকে অস্তগামী সূর্যের মতো অবসন্ন করে তুলেছে। ফলে, সমাধানহীন সময়ের সুতোয় বাঁধা পড়ে জীবনস্রোতে ভেসে চলার যে অভিমুখ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট তাকেই গুণ টানা ডিঙির সাহায্যে প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

আঘাত : প্রেমাস্পদের অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত একাধিক রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রতীকায়িত হয়েছে। এরূপ আঘাত সাধারণত উপন্যাসের নারীচরিত্র এক অমোচনীয় প্রণয়-অভিজ্ঞানরূপে বহন করবার মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড়তাকে প্রকাশ করে। নরনারীর জটিল মনোসম্পর্ককে ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নায়নের লক্ষ্যে এই ধরনের বিপ্রতীপ অনুষঙ্গ ব্যবহার লক্ষ করা যায় *চোখের বালি* এবং *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে। *চোখের বালি* উপন্যাসে মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর তরল সম্বন্ধের প্রতি ঘৃণায় বিমুখ হওয়া বিহারী নিজের অজান্তে বিনোদিনীর কনুইয়ের কাছে আঘাত করে। আহত বিনোদিনীর শুশ্রূষায় মহেন্দ্র এগিয়ে এলেও তা প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী—

> বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, " আমি ব্যাথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক।" (পরিচ্ছেদ ২৮, *চোখের বালি*)

বিনোদিনী সযত্নে লালন করেছে এই আঘাত। বস্তুত, এই আঘাতকেই প্রেমের স্মারক বিবেচনায় বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসাকে প্রতীকায়িত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্র যতখানি স্থূলতায় বিনোদিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছে, বিনোদিনী তার বিপরীত ক্রমে গভীর শ্রদ্ধায় আত্মসমর্পণ করেছে বিহারীর নীতিবোধ-আবৃত ব্যক্তিত্বের কাছে। বিনোদিনী যে কেবল অচরিতার্থ প্রেম-প্রত্যাশায় কিংবা স্থূল প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের রুচিবোধকে বিসর্জন দেয়নি বরং মহিমান্বিত প্রেমানুভূতিকে যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও লালন করতে চেয়েছে, সেই সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভবকেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রতীকের সাহায্যে নান্দনিকমাত্রায় চিহ্নায়িত করেছেন।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীও একইভাবে শচীশের অবচৈতন্যের পদাঘাত হৃদয় ও বক্ষস্থলে ধারণ করেছে আমৃত্যু। অধ্যাত্ম রসপ্রত্যাশী শচীশের কাছে নিজের সর্বশেষ আশ্রয় প্রত্যাশা করেও দামিনী ফিরে এসেছে এক বুক আঘাত নিয়ে। এই আঘাত কেবল মানসিকভাবেই তার মধ্যে ছাপ ফেলেনি, শারীরিকভাবেও সে বহন করেছে সেই বেদনার রেশ। শচীশের মধ্যে সে কোনো আধ্যাত্মিকতা-উত্তীর্ণ সমন্বিত গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশাও সে কখনো অনুভব করেনি; বরং তার জীবনে যা কিছু প্রাপ্তি তা সে পেয়েছে শ্রীবিলাসের অকপট ঔদার্য্য ও নিখাদ ভালবাসায়। কিন্তু যে প্রেমকে দামিনী তার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রোথিত করে রেখেছিল সে না পাওয়া প্রেমের অভিজ্ঞানস্বরূপ আঘাত তাকে হয়তো আমৃত্যু দিয়েছে কোনো নিবিড় প্রশান্তি। তাই তার অনুভব:

> "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি কিছু তোমার যোগ্য।" (শ্রীবিলাস ৫, *চতুরঙ্গ*)

লক্ষণীয় দামিনীর এ প্রত্যাশাহীন অত্যুচ্চ প্রেমবোধ শ্রীবিলাসের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো ঈর্ষা কিংবা অহং-এর দেওয়াল তৈরি করে না, বরং কোনো এক অনির্দেশ্য নান্দনিক অনুভবে পাঠককে আপ্লুত করে। বস্তুত শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিন্নমাত্রিক দ্যোতনা সঞ্চারে আলোচ্য প্রতীক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সূচিকর্ম : রবীন্দ্র উপন্যাসের নারী চরিত্রের সামান্য বৈশিষ্ট্য সূচিবিদ্যায় পারদর্শিতা। তবে, সকল ক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো তাৎপর্যে চিহ্নায়িত না হলেও কখনো-কখনো সংশ্লিষ্ট চরিত্রের মনোগঠন, আচরণ,

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য কিংবা গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে সূচিকর্ম তাৎপর্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম। প্রসঙ্গত, *চোখের বালি* উপন্যাসে বিনোদিনীর সূচিকর্মের দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য[১]। দ্বিতীয়বার বিনোদিনীর নিজ গ্রাম থেকে কলকাতা আগমনের পর ভিন্ন বাড়িতে অবস্থানের প্রেক্ষাপটে মোহগ্রস্ত মহেন্দ্রর আবেগী আচরণের সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সূচিকর্মের প্রতীকী পরিচর্যা। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থির ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর! বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর! আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।"
> বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহু যত্নে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ৪১)

বিনোদিনীর এ ভুল সেলাই এবং তা খুলে 'যত্ন' সহকারে 'আলোর কাছে' ধরে পুনরায় খোলার চেষ্টা নিজের পরিস্থিতি-বিড়ম্বিত জীবনকে আরেকবার অতি যত্ন সুবিন্যস্ত করবার ইপ্সিত প্রয়াসকেই সংকেতিত করে। এই পুনঃপ্রচেষ্টায় মহেন্দ্রর কোনো স্থান নেই। তাই মোহগ্রস্ত মহেন্দ্রর আবেগাত্মক অভিমান বিনোদিনীর মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বিহারীর দৃষ্টিতে বিনোদিনী যে আলোর সন্ধান পেয়েছিল তাই যেন তার জীবনাকাঙ্ক্ষাকে আরও বহুগুণ বিবর্ধিত করেছিল; আর তাই এই শূন্য থেকে শুরুর আন্তরিক আগ্রহ।

মাতাল: রবীন্দ্র উপন্যাসে মাতালের উপস্থিতি সাধারণত দুর্দৈবের অশনি সংকেত বহন করে। বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রসমূহের আসন্ন বিপদ কিংবা অনিবার্য সংকটের সমান্তরাল দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয় মাতালের প্রসঙ্গ। *নৌকাডুবি* উপন্যাসে বিবাহিত স্ত্রী ও অত্মীয়সহ রমেশের গৃহযাত্রার বর্ণনায় লক্ষণীয়:

> কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২)

অর্থাৎ যে, অত্যাসন্ন ঘূর্ণিঝড় রমেশের জীবনকে করে তুলবে মনস্তাত্ত্বিক দোলাচলে আলোড়িত, সেই ভাবি বিপদেরই প্রতীকী সংকেত এই মাতালের চক্ষুর ঘোলাটে রং। আবার *যোগাযোগ* উপন্যাসে মধুসূদন-কুমুদিনীর মনোগত ব্যবধানের যে ক্রমবর্ধমান বিন্যাস পাঠকৃতির আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত তারই এক তীর্যক প্রতীকাভাস শিল্পিত হয়েছে মাতালের অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। মধুপ্রাসাদের প্রথম রাতেই উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক যে গভীর অহং-সংকটের দ্বান্দ্বিকতায় জটিল হয়ে উঠবে, তার সাংকেতিক বর্ণনায় লেখক মাতালের প্রসঙ্গের অবতারণা করে মূলত মধুসূদন-কুমুদিনীর অপ্রকৃতস্থ দাম্পত্যসম্পর্ককেই চিহ্নায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মালঞ্চ : নিঃসন্তান দম্পতির সকল অনুভবের কেন্দ্রবিন্দু এক পুষ্পকানন— এর আশ্রয়েই *মালঞ্চ* উপন্যাসের কাহিনী বিকশিত। প্রস্ফুটিত বাগান আর তার বিপরীতে বিশুষ্ক মলিন নীরজা, যার অক্লান্ত

---

[১] প্রসঙ্গত *গোরা* উপন্যাসের লাবণ্যর উদ্দেশ্যমূলক সূচীকর্মের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তবে, উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনা কোনো প্রতীকী তাৎপর্যে বিন্যস্ত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

যত্ন ও ভালোবাসায় এই বাগানের ক্রমবিকাশ, এই পরস্পর বিপরীত প্রতিবেশ সৃজনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নরনারীর বিশেষত নীরজার মৃত্যুময় যন্ত্রণাবোধই প্রতীকায়িত। নীরজার মাঝে যে অপূর্ণতা, অসহায়ত্ব, তাকে প্রকটিত করে তুলতেই ঔপন্যাসিক যেন এক পল্লবিত পুষ্পবিতানের প্রতীক ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এই মালঞ্চকে কেন্দ্র করেই নীরজা আর আদিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর এর অন্তর্স্রোতে আছে আদিত্য ও সরলার আবাল্য প্রচ্ছন্ন অনুরাগের ক্রমবিবর্ধনের ইতিহাস। অসুস্থ নীরজার মনোদ্বন্দ্ব, আদিত্য-সরলার মানসিক বন্ধন এ সকল কিছুর নীরব অথচ সংকেতসঞ্চারী অভিক্ষেপ ধারণ করে আছে মালঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ যেন উপন্যাসের শিরোনামার মধ্যেই এক প্রতীকী দ্যোতনাসামর্থ্য প্রোথিত করেছেন এই রচনায়। ফলে, ফুলের বাগানের সমৃদ্ধি আর আধুনিক মানব মনের অস্থির অসঙ্গতি এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক শিল্পরূপায়ন প্রকটিত হয়েছে আলোচ্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে।

বৃক্ষ: প্রকৃতি রবীন্দ্ররচনায় বহু-অনুসৃত একটি অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রকৃতিচেতনার সূত্র ধরে বিভিন্ন উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে বৃক্ষের প্রসঙ্গ, যা কখনো-কখনো সমগ্র পাঠকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশিষ্ট প্রতীকতায় উত্তীর্ণ হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় *চোখের বালি* উপন্যাসে পারিবারিক চড়ুইভাতিতে গিয়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে বিহারী ও বিনোদিনীর কথোপকথন। আলোচ্য প্রসঙ্গে বটগাছ যেন বোধিস্বত্ব অর্জনের দূরাগত ব্যঞ্জনায় বিনোদিনীর প্রতি বিহারীর প্রথম জেগে ওঠা শ্রদ্ধাবোধকে প্রতীকায়িত করে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাব হইল, মহেন্দ্র কোনো মতেই গা দিল না, এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। ... বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ মায়ের কথা, বাল্যসখির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যেন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল।... বিহারী ভাবিল, "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। (পরিচ্ছেদ ১৭, *চোখের বালি*)

কেবল বটগাছই নয়, বিভিন্ন গাছের অনুষঙ্গকে উপন্যাসের পাঠকৃতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের শিশুগাছের সারির প্রসঙ্গ:

> নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে শিশুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের একদিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা-বাসর-ঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণ বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। (শ্রীবিলাস ১, *চতুরঙ্গ*)

দামিনীর মৃত্যুকে মেনে নিয়েও শ্রীবিলাস আপন অন্তরে তার জন্য যে অমর আসন প্রতিষ্ঠা করেছে, তারই বস্তুপরিপ্রেক্ষিতরূপে এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হযেছে বৃক্ষ-প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙা আখরোট: *শেষের কবিতায়* পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত আলোচ্য শব্দবন্ধ অমিত-লাবণ্যর প্রাত্যহিকতা-উত্তীর্ণ মহিমাময় প্রেমানুভবের প্রকৃতিকে প্রতীকী আবহে নির্দেশের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

> অমিত সামনাসামনি বসে বললে, 'সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।
> লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। (পরিচ্ছেদ ৭)

লাবণ্যের সঙ্গে অমিতর যে সম্পর্ক, তা যেন আখরোটের কঠিন বহিঃত্বকের রহস্যে আবৃত কোনো ফলের মতোই সংগুপ্ত অথচ চিরসত্য; অথচ জীবনবাস্তবতায় এ মহিমান্বিত প্রেমসম্পর্ক 'নিষ্ফলা পিচগাছের' মতোই উষর। এমনকী সেই অতিসংবেদনশীল সত্যকে দৈনন্দিন দাম্পত্যের বন্ধনে বাঁধতে হলেও তার রহস্যের মায়াবী আচ্ছাদনকে সরিয়ে দিতে হয়— যা আপাত মিলনের অন্তরালে ভাঙা আখরোটের দ্বিভাজিত আবরণের মতোই রহস্য-উদ্দীপিত বর্ণিল প্রণয়কে হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ঔপন্যাসিক এই অভিন্ন অনুভবকেই আবার ব্যবহার করেছেন লাবণ্য আর অমিতর প্রত্যক্ষ বিচ্ছেদের কালে, জন্মবন্ধ্যা যুক্যালিপ্‌টাসের পটভূমিতে।—

> তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, 'দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পারো। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।
>
> এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল। অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল যুক্যালিপ্‌টাস্-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোল ছড়ানো। (পরিচ্ছেদ ১৩, *শেষের কবিতা*)

উভয়ের প্রেমসম্পর্কের সুগভীর রহস্যময় বহুস্বর ও তাদের ব্যতিক্রমী অনুভব আলোচ্য ভাঙা আখরোটের প্রতীকতায় উন্মোচিত।

ভাঙা হাড়ি : *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে দামিনীর অনাকাঙ্ক্ষিত বিভগ্ন জীবনকোঠামোর প্রতীকাভাসে ব্যবহৃত হয়েছে ভাঙা হাড়ি এবং তাতে ফুলগাছের চর্চার অনুষঙ্গ। সমগ্র উপন্যাসে দামিনী যে জীবনার্থের প্রত্যাশা করেছে অথচ সে কাম্য জীবনরূপ প্রতিমুহূর্তে হয়েছে আহত, বিচূর্ণ। দামিনী চরিত্রের এ বিপন্ন অবয়ব মূলত শিল্পরূপায়িত হয়েছে আলোচ্য প্রতীকের আশ্রয়ে।

বিধ্বস্ত জাহাজ : রবীন্দ্র উপন্যাসে একাধিক প্রসঙ্গে উপমান-আশ্রয়ী প্রতীকতায় ব্যবহৃত হয়েছে মাস্তুল ভাঙা পাল-ছেঁড়া বিধ্বস্ত নৌযানের অনুষঙ্গ। *গোরা* উপন্যাসে গোরা কিংবা বিনয়ের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের চিহ্নায়নে জাহাজ, নাবিক, কম্পাস কিংবা মাস্তুলের প্রসঙ্গ আসলেও এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বহুস্তরিক দ্বন্দ্ব যতখানি প্রকাশিত হয়েছে, তার চেয়ে ঔপন্যাসিকের তর্কমুখর ভাষার সৌকর্য সৃজনের আকাঙ্ক্ষাই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে শচীশের জীবনস্বরূপের হ্যাঁ ও না এর যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ ঘনীভূত ও জটিল হয়ে উঠেছে তারই শিল্পপ্রকাশ লক্ষ করা যায় 'ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজে'র সঙ্গে শচীশের মনোপরিস্থিতির তুলনামূলক পদবন্ধে। এ যেন

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাভিযানে ব্যর্থতার ইঙ্গিতবাহী। প্রায় অভিন্ন পদবন্ধ *যোগাযোগ* উপন্যাসে মুকুন্দলালের বিলীনপ্রায় সামন্ত অবস্থানের চিহ্নায়নে লক্ষ করা যায়। 'মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ'— ঔপন্যাসিকের এই অভিব্যক্তি এক প্রতীকী তাৎপর্যে মুকুন্দলাল তথা তার উত্তরাধিকারী বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর দীর্ণ ভবিষ্যতের পরিণতি-বার্তা বহন করে।

পাখি ও অন্যান্য অবপ্রাণী : রবীন্দ্র উপন্যাসে বহুব্যবহৃত পাখি প্রতীক বিভিন্ন প্রতিবেশে বিচিত্রমাত্রায় ব্যবহৃত। সাধারণত মানবিক অচরিতার্থতা কিংবা উদগ্র কোনো প্রত্যাশাকে লালনের সূত্র ধরে এই প্রতীক ব্যবহৃত হয়। তবে, সকলক্ষেত্রে সাধারণভাবে, পাখি পদবন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কখনো-কখনো নিজস্ব নামেও বিভিন্ন পাখির প্রতীকী উপস্থিতি পরিলক্ষিত। *চোখের বালি* উপন্যাসে মহেন্দ্র-বিনোদিনী-আশার মনো-অভিব্যক্তি প্রকাশের সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বিবিধ পাখির নাম। সংসার অনভিজ্ঞ আশা ও মোহগ্রস্তমহেন্দ্রর দাম্পত্যসুখের অমিতচারী উচ্ছ্বাসের অন্তর্স্রোতে যে ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠছিল তারই নির্দেশকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে মৃত কোকিলের প্রতীক। —

> আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাখির আজ কী হইল।"
> মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কণ্ঠ শুনিয়া লজ্জাবোধ করিতেছে।"
> আশা সানুনয় স্বরে কহিল, "না, ঠাট্টা নয়, দেখো-না উহার কী হইয়াছে।
> মহেন্দ্র খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার উপরের আবরণ খুলিয়া দেখিল পাখি মরিয়া গেছে। (পরিচ্ছেদ ৮, *চোখের বালি*)

আশা এবং বিনোদিনীর সখ্যের রূপকাভাসেও ব্যবহৃত হয়েছে চকোরীর চিহ্নায়ক। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে বিনোদিনীর সবল অন্তর্ভেদ কৌতুকে পরিবেশিত হয়েছে এই সংকেতের মাধ্যমে। —

> পরদিন প্রত্যুষে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, "এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দরবারে।" (পরিচ্ছেদ ১৩, *চোখের বালি*)

মেঘের রূপকে বিনোদিনীর আত্মঅবস্থান যেমন নির্দেশিত, তেমনি তার ভবিষ্যৎ সংকটও যেন এর মধ্যদিয়ে প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে।

পাখি প্রতীকের বিবিধ অভিক্ষেপ লক্ষ করা যায় চিল, বাজপাখি, বাদুড় প্রভৃতি অবপ্রাণীবাচক প্রতিমার প্রতীকী ব্যবহারের শিল্প সফলতায়। চিলের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ বিধৃত হয়েছে *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে। আহত চিলের সযত্ন লালন দামিনীর নিজের অসহায় দোদুল্যমান অস্তিত্বের সঙ্গে সমীকৃত।—

> ... খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন-দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল; সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে; তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে। (শচীশ ১০, *চতুরঙ্গ*)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় আহত চিলের ওপর কাকের দলের আক্রমণও যেন দামিনীর বৈধ্যব্য ও অধ্যাত্ম আক্রান্ত জীবনকে প্রতীকায়িত করে তোলে। এছাড়াও আহত চিল প্রতীকের অন্যতম প্রয়োগ লক্ষ করা যায় *চার অধ্যায়* উপন্যাসে। তবে, *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে এই চিল প্রতিমার অভিন্ন ধারাবাহিকতায় ব্যবহৃত হয়েছে বেজির অনুষঙ্গ। আপাতভাবে, পোষা প্রাণীর গোত্রের বাইরের এই প্রাণীকে যে অকৃত্রিম মমতায় দামিনী লালন করেছে, তার জন্য শ্রীবিলাসের সময়-শ্রম গ্রাস করে শচীশের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে এ সকল কিছুই প্রকারান্তরে দামিনীর অদম্য জীবনতৃষ্ণাকেই প্রতীকায়িত করে।

বাজপাখি প্রতিমা ব্যবহৃত হয়েছে *যোগাযোগ* উপন্যাসে মধুসূদনের প্রতি কুমুদিনীর রুচিবৈষম্যের শঙ্কাকে প্রতীকায়িত করবার উদ্দেশ্যে। মধুপ্রাসাদে তাদের প্রথম দাম্পত্য জীবনের সূচনা মুহূতেই এক অনির্দেশ্য ভয় গ্রাস করেছে কুমুদিনীকে।—

> আকাশ থেকে বাজ-পাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। (পরিচ্ছেদ ২৪, *যোগাযোগ*)

মধুসূদনের সঙ্গে তার অপ্রতিসম দাম্পত্যজীবনের যে পূর্বাভাস তার হৃদয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তারই ইঙ্গিত বহন করে চলেছে এই প্রতীক।

বাদুড় প্রতিমার নান্দনিক প্রয়োগ উৎকীর্ণ হয়েছে *মালঞ্চ* উপন্যাসে, নীরজার ক্ষয়িষ্ণু জীবনের রূপায়ণে। নীরজা-আদিত্যের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য, ফলপ্রসূ সুবিস্তৃত কানন এ সকল কিছুর মাঝে চলৎশক্তিরহিত নীরজা চরমভাবে অনুভব করেছে নিজের অসম্পূর্ণতা। স্বামীর প্রতি উদগ্র ভালোবাসা, আপন হাতে গড়া বাগানের প্রতি অপত্যপ্রতিম মমতা এ সকল কিছু এক নিমিষে শূন্য করে দিয়েছে তার দুরারোগ্য ব্যাধি। তাই ঔপন্যাসিক তার মানসিক অবস্থাকে চিত্রায়িত করেন এভাবে:

> নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্রপ্রয়োজনের অযোগ্য। (পরিচ্ছেদ ১, *মালঞ্চ*)

অযোগ্যতা আর সুগভীর অসম্পূর্ণতায় দংশিত জীবনভার আমৃত্যু বয়ে চলার আভাস চিহ্নায়িত হয়ে উঠেছে এই প্রতিমায়।

পাখির সমগোত্রীয় বিবিধ অবপ্রাণীবাচক অনুষঙ্গ ছাড়াও অজগর সাপ কিংবা কল্পিত প্রাণীর অবপ্রাণীতুল্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায় রবীন্দ্র-উপন্যাসে। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুরুতর আহত নিখিলেশের বিপদের পূর্বাভাস জানাতে ব্যবহৃত হয়েছে অজগর সাপের প্রতিমা। ক্রুদ্ধ উন্মার্গগামী জনতার বিচলনকে অজগরের বিসর্পিলতার সঙ্গে প্রতিতুলনায় রূপায়িত করবার মধ্য দিয়ে উদ্ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব থেকে প্রত্যাবর্তিত বিমলার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। —

Dhaka University Institutional Repository

> অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল, একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে। (বিমলার আত্মকথা)

বস্তুত, নানাবিধ দাম্পত্যজটিলতা থেকে উত্তীর্ণ বিমলা যে পুনরায় সংকটগহ্বরে নিপতিত হতে যাচ্ছে তারই প্রতীকায়িত রূপ ফুটে উঠেছে এই প্রতিমায়।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে কল্পিত আদিম জন্তুর পরাবাস্তববাদী অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে শচীশের মনোজগৎকে ভিন্নতর মাত্রায় ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।—

> সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল, সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যাথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে। (শচীশ ১০)

আদিম প্রাণীর এই সংগুপ্ত বেদনা যেন শচীশের অবচেতনা লালিত অব্যক্ত প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা। দামিনী ভোগের সামগ্রী বলে সে সচেতন ভাবে তাকে ত্যাগ করলেও অবচেতনায় তাকে আদিম আকর্ষণে কামনা করেছে। সেই কামনায় যতখানি ভোগ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে বেদনা। সেই যন্ত্রণাভারকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে।

অন্যান্য অবপ্রাণীবাচক প্রতীকের মধ্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অজগরভিন্ন সাপের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে সাপ অনুষঙ্গকে বিচিত্র মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপন্যাসসাহিত্যে বিভিন্ন পাঠকৃতির বিবিধ চরিত্রের মনোসংকট ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকে রূপায়ণের জন্য একদিকে সাপের হিংস্রতা, বিসর্পিল ক্লেদ-স্বভাব যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, সাপের সঞ্জননশক্তি, এর ত্বকের চিক্কণ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিও অত্যন্ত নান্দনিকভাবে তাঁর উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিধৃত এই প্রতীকপুঞ্জ সর্বদায় বহুমাত্রায় উচ্চকিত, সুনিবিড় নান্দনিকবোধে উত্তীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিহৃদয়ের যে মৌল অভিসংযোগ সর্বদা ঔপন্যাসিকসত্তার সঙ্গে স্থাপন করতে চেয়েছেন, তার শিল্পসফল রূপায়ণ ঘটেছে এ সকল নান্দনিক প্রকরণে। বস্তুত, প্রতীক যে অস্পষ্ট, সংগুপ্ত নির্দেশনাহীন পথে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে তার দ্যোতনাবহুল শিল্প-ভাবসঞ্চারক অবস্থানটি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তার উপন্যাসে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন।

রবীন্দ্র উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীকের শৈলীগত অনুধাবনে রচয়িতার নিজস্ব গদ্যভাষার নিগূঢ় সঞ্চালন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্র ধরে বাংলা ঔপন্যাসিক গদ্য যে আধুনিক শিল্পসংসক্ত বিশ্বমানপ্রত্যাশী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেই মানবীয় সকল অনুভব প্রকাশের উপযুক্ত এক শৈল্পিক উচ্চতা প্রদান করেন। উপন্যাস রচনার সূচনা থেকেই তার গদ্য বলিষ্ঠ,

Dhaka University Institutional Repository

বহুস্তর ভাবকে ধারন করেতে সক্ষম। সেইসঙ্গে তার গদ্যের রূপময়তা, প্রতিমানির্ভর ইন্দ্রিয়বেদী সঞ্জীবিত ভাষা উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজনকে আরও বেশি রসাভিমুখী করে তুলেছে। একান্ত স্বাতন্ত্র্যে এ সকল শিল্প উপকরণ হয়ে উঠেছে নিগূঢ় নিজস্বতা শক্তিতে উজ্জীবিত। এমনকী রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বরাবর নিজেকে অতিক্রম করে যাবার সাধনায় ছিলেন একনিষ্ঠ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে সামান্য লক্ষণকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষা সর্বদা আত্মস্থ করতে চেয়েছে তা হল ভাষার মধ্যে ভাবের নিবিড়তা। তাই তাঁর উপন্যাসের আলঙ্কারিক ভাষা কেবল কোনো বাহ্যিক প্রসাধন নয় বরং এক সুগভীর প্রাণের প্রকাশে সে ভাষা পাঠকৃতির ভাবদ্যোতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জিত ভাষাশৈলী সূচনাকাল থেকেই প্রমুখনের শক্তিতে ঋদ্ধ। তাঁর উপন্যাসে পরিবেশ বর্ণনা, আখ্যান বিন্যাস কিংবা চরিত্র মনস্তত্ত্বের শৈল্পিক বিস্তার প্রমুখনের সূত্রে পাঠকের সম্মুখে বিচিত্রমাত্রিক বোধ-সম্ভাবনায় সংকেতিত হয়। অনিবার্য শৈল্পিক কার্যকারণসূত্রে বিভিন্ন উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীক ব্যবহৃত হওয়ায় তা হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগপৎভাবে, প্রমুখিত (foregrounded) উপমা-চিত্রকল্প কিংবা প্রতীক ধারণ করে সমগ্র পাঠকৃতির মৌল প্রবণতা, কেন্দ্রীয় ভাববিশ্ব, কখনো-বা সার্বিক গঠনকাঠামোর চিহ্নায়িত দিকনির্দেশনা। রবীন্দ্র-উপন্যাসের শৈলীগত প্রবণতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ভাষিক গঠন সাধারণত সাধুরীতি আশ্রিত। তবে, সংশ্লিষ্ট শিল্প-উপকরণসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শৈল্পিক প্রমুখনের কারণে সাধু রীতির মাঝেই রবীন্দ্রনাথ এক সুনিবিড় গীতল আবেশ প্রোথিত করে দিয়েছেন। তাই, সংলাপধর্মী বাক্যে ক্রিয়াপদ কিংবা বিশেষণের সাধুরূপ ব্যবহৃত হলেও সর্বনামপদের ব্যবহার চলতিরীতির অনুবর্তী; বিশেষত মুল বক্তব্যের চলন অনেকাংশেই মৌখিকসদৃশ। রবীন্দ্রনাথ *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে প্রথম সার্বিকভাবে চলতি রীতি ব্যবহার করলেও অন্তত *চোখের বালি* উপন্যাস থেকেই তার এই সহজ সংজ্ঞাপনসুলভ ভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। একইসঙ্গে, অন্বিষ্ট ভাবের দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন যতিচিহ্নের যথোপযুক্ত ব্যবহার বিভিন্ন উপন্যাসের আলঙ্কারিক ভাষাকে অধিকতর নান্দনিক করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাক্য গঠন প্রধানত সরল হলেও কখনো-কখনো আবেগী প্রতিবেশ সৃজনে পদাংশবহুল দীর্ঘ বাক্য কিংবা সংক্ষিপ্ত অথচ সমান্তরাল বাক্যগুচ্ছের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে, রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিবিধ উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীকের সূত্রে ঔপন্যাসিকের যে বৈশেষিক বিচ্যুতি সামর্থ্য সর্বাধিক প্রকটিত হয়ে ওঠে, তা হল বিশেষণ সৃজনের অনন্যসাধারণ দক্ষতা। উপমা কিংবা চিত্রকল্প বা প্রতীকে চিহ্নায়ক বিগঠনের জন্য লেখক অনিবার্যভাবে বিশেষণ গঠন করতে আগ্রহী হন। এই নির্বিকল্প বিশেষণের সমাবেশ রবীন্দ্র উপন্যাসে পূর্বাপর ব্যতিক্রমচিহ্নিত। কেননা, কখনো কোনো বিমূর্ত ভাব, কখনো-বা কোনো প্রচল অনুষঙ্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার অথবা চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের মাঝে কোনো অভূতপূর্ব সম্পর্ক স্থাপন— এ-সকল কৌশলের সূত্রে বিভিন্ন উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীক বিশিষ্ট নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ হয়। সেইসঙ্গে সমাসবদ্ধ পদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বাক্যবন্ধের রূপমূল গঠনে বৌদ্ধিক আবেশ সঞ্চার প্রভৃতির সূত্রে রবীন্দ্র উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের শৈলী সৃজন করে এক শিল্পবোধের ভাষাসৌধ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়ন : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়ন : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক, সংগঠন ও রসাবেদনে পৃথক। পরিবর্তমান সময়চেতনা, বিশ্বাস ও বোধের দার্শনিক ব্যবধান এই দুই শিল্পীর শিল্পসাধনায় এনে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। প্রাথমিক পর্বের রবীন্দ্র-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ দুর্লক্ষ না হলেও প্রধানত ব্যঞ্জনাগত বৈচিত্র্যে উভয়ের ভেদরেখা বরাবরই সুস্পষ্ট। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উভয় ঔপন্যাসিকের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়ন-কৌশল শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় প্রতিপাদিত হয়েছে। ওই প্রত্যয়েরই ধারাবাহিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্যারাডিগম্যাটিক এবং সিনট্যাগম্যাটিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করা একান্ত প্রাসঙ্গিক।

উপমা-জগৎ সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্যারাডাইম বারবার প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছেন তাদের অন্যতম হল নিসর্গ, মানবীয় আবেগ-অনুভব, বিভিন্ন প্রাণী ও অবপ্রাণীর স্বভাব ও ক্রিয়াশীলতা, রোমান্টিক সংবেদনশীলতা এবং বিবিধ সমাজ-অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে, কখনো-কখনো বহুপ্রচল উপমান-অনুষঙ্গ পুনর্জীবন লাভ করেছে তাঁদের উপন্যাসে। আপাতদৃষ্টিতে উভয় ঔপন্যাসিকের কাঙ্ক্ষিত প্যারাডিগম্যাটিক সজ্জা প্রায় অভিন্ন-উৎসজাত হলেও এদের নির্বাচনের লক্ষ্য ও বিন্যাস অভিন্ন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপমা-জগৎ যেখানে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় রসসৃজন-প্রত্যাশী, রবীন্দ্রনাথ সেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়-স্তর অতিক্রম করে উপমাকে মানবমনের গহীন স্তর-অভিমুখী করে তুলতে আগ্রহী। ফলে, অভিন্ন অনুষঙ্গ ব্যবহার করেও তাঁদের উপমাজগৎ ভাব সঞ্চারে পৃথক, শিল্পলক্ষ্যে স্বতন্ত্র। তুলনামূলক দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

ক. কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী— "সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতাবেগে বাড়িয়া উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

খ. জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশের প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত দুটো দৃষ্টান্তে উপমান-উৎস অভিন্ন হলেও সিনট্যাগম্যাটিক বিন্যাস পৃথক; যা এদের রসোপলব্ধিতে যোজনা করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পাখির বন্দিত্বের সঙ্গে, বিশাল প্রাসাদে বন্দি কুন্দরন্দিনীর বস্তু-অবস্থান ও তার আবেগী সংরূপকে উপমিত করতে আগ্রহী, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আকাশে ডানা মেলা মুক্তবিহঙ্গের প্রতিতুলনায় উদয়াদিত্যের শৃঙ্খলিত জীবন ও তার মনোলালিত স্বাধীনতা-প্রত্যাশার বিমূর্ত হৃদয়ানুভূতিকে একমাত্র শিল্পলক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তাই আলোচ্য 'ক' দৃষ্টান্তে কুন্দনন্দিনীর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবেই প্রচ্ছন্ন, অথচ 'খ' দৃষ্টান্তে উদয়াদিত্যের মনোমুক্তির সুতীব্র প্রত্যাশা শৃঙ্খলবিহীন পাখির চিহ্নায়কে অনেক বেশি শিল্প-স্পষ্ট হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উভয় ঔপন্যাসিকের শিল্পীস্বভাবের এই পার্থক্য উপমাদুটির রসাবেদনেও সৃষ্টি করেছে ব্যাপক ব্যবধান। ওই ব্যবধানের কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপমা-জগৎ কোনো বিশিষ্ট শিল্পসমীকরণে একীভূত হয় না। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

ক. স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।" (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

খ. প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না— সেই দুই-চারি লাইন কালির দাগকে অতীত হইতে, বর্তমান হইতে, একেবারেই মুছিয়া ফেলিবার, একেবারেই 'না' করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই কেন। ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারি দিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। (পরিচ্ছেদ ২৪, *চোখের বালি*)

উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্তই শিল্পমাত্রায় রসস্পর্শী, কিন্তু গতি ও আবেগ-দ্যোতনায় পৃথক। 'ক' দৃষ্টান্তে মতিবিবি অনড় আত্মসংকল্পে উপন্যাসের আসন্ন সংকটকেন্দ্র সৃজনে সক্রিয়, অথচ 'খ' দৃষ্টান্তে বিনোদিনী অপমান আর বিক্ষত ব্যক্তিত্বের ভারে দিশেহারা। মতিবিবির অন্তর্জাত ক্ষোভ প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার নাট্যিক ক্রিয়াশীলতায়; কিন্তু বিনোদিনীর প্রতিকারহীন মনোযন্ত্রণা ও তার অন্তহীন অস্থিরতার নিগূঢ় প্রকাশে নাটকীয় ভাষাবিন্যাস যেন যথেষ্ট নয়। তাই এর সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে নিবিড় বোধস্পর্শী গতি-চেতনা, যা বিনোদিনীর সচল আবেগ ও ধারাবাহিক সংক্ষোভের বিন্যাসে তড়িৎ-প্রতিম সক্রিয়তায় পাঠকৃতিতে উপস্থাপিত। এ কারণে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহৃত 'স্রোতবিহারিণী রাজহংসী' কিংবা 'দলিতফণা ফণিনী'র চিহ্নায়কে যে নাট্যিক মন্থরতা বিদ্যমান তা রবীন্দ্রনাথের উপমায় অনুপস্থিত। আত্মপরিচয়ের সংকট আর ব্যক্তিত্বের অবমাননায় উদ্ভ্রান্ত বিনোদিনীর অনবস্থাকে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল গতিময় ক্ষণস্থির চিহ্নায়ক; যা রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'ক্রুদ্ধা মধুকরী'র পদকাঠামোয় নিবিড়-বোধস্পর্শী শিল্পসৌন্দর্যে বিন্যস্ত হয়েছে। একইসঙ্গে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ উপমান উৎস নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ক্রমশ বৈচিত্র্যসন্ধানী হয়ে ওঠেন। এ কারণে তাঁর বিশ শতকে রচিত উপন্যাসসমূহে মানব জীবনের নানা অনাবিষ্কৃত অনুষঙ্গ, অন্য কোনো শিল্পমাধ্যম কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উপমান সৃজনের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রঙ্গনাট্য, চিত্রশিল্প, শরীরতত্ত্ব, মহাকাশ বিজ্ঞান, ভাষা-ছন্দ, সংগীতশাস্ত্র, জৈব রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞানশাখাকে তিনি তাঁর উপমাসহ বিভিন্ন শিল্প উপকরণের প্যারাডাইম নির্বাচনের উৎসরূপে ব্যবহার করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা এবং পরিশিষ্টে সংকলিত উপমার সম্পূরক তালিকার 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অংশের ১৩, ১৬, ১৯, ২০, ২৬, ৩২, ৩৪, ৪২, ৪৩ সহ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করলেই এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কালগত কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পজগতের এরূপ ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ ছিলনা। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিষয়ক আলোচনায় কিংবা পরিশিষ্টে সংযোজিত উপমার সম্পূরক তালিকার 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' অংশে উপমান- উৎসের এরূপ বিস্তার সুলভ নয়। এভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপমাসৃজন প্রক্রিয়া থেকে গুণগত ও মাত্রাগত বৈভিন্ন্যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার শুরু থেকেই স্বতন্ত্র অবস্থানে সরে এসেছেন, যা কালব্যবধানে আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের চিত্রকল্প-জগৎকে স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসে বহুস্বরিক চিত্রকল্প সৃজনে পথিকৃৎ-ভূমিকা পালন করেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা, উপন্যাসের পাঠকৃতি-বিন্যাসে চিত্রকল্প অপেক্ষা সুললিত চিত্রনির্মাণেই বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো-কখনো বড় প্রতিভাসুলভ স্বতস্ফূর্ততায় বঙ্কিম-উপন্যাসে সৃজিত হয়েছে আলোকসামান্য চিত্রকল্প। বিষয়টি স্পষ্ট করবার লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত বিবেচ্য :

ক. অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল। (*ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ, বিষবৃক্ষ*)
খ. দেখতে সে [কুমুদিনী] সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড। (পরিচ্ছেদ ৩, *যোগাযোগ*)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে ফুলের প্যারাডাইম ব্যবহার করে দুই বেদনাভারাক্রান্ত নারীর জীবনকে চিহ্নায়িত করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে ম্রিয়মাণ কুন্দনন্দিনীর অকাল পরিণতি না-ফুটতেই-শুকিয়ে-যাওয়া কুসুমের চিহ্নায়কে নির্দেশিত, যা রূপকাভাসে জাগিয়ে তোলে এক সুগভীর বিষাদের ব্যঞ্জনা। অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড' জীবন-ব্যর্থ-হতে-চলা এক নারী কুমুদিনীর ঋজু ব্যক্তিত্বকে ধারণ করে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর বেদনাপ্লুত পরিণতি যেখানে বিশুষ্ক ফুলের সঙ্গে সমীকৃত, সেখানে রবীন্দ্র-রচনায় পুষ্পদণ্ডের মধ্যে সন্ধান করা হয়েছে নারীর পরিশুদ্ধ মর্যাদাবোধ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শিল্প-অন্বেষণের এই প্রভেদ পূর্বাপর সুস্পষ্ট। চিত্রকল্প সৃজনে উভয় ঔপন্যাসিকের রচনাতেই রঙের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রকল্পের জগৎ রঙের বহুবর্ণিলতায় কোনো বিশেষ মাত্রা পায়না, বরং প্রাকৃতিক বিভিন্ন বর্ণকে কার্যকারণসূত্রে যৌক্তিক ও বাস্তব করে উপস্থাপনের তাগিদই সেখানে বেশি। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্প সৃজনে সবচেয়ে অধিক ব্যবহার করেছেন সাদা কালো ও ধূসর বর্ণ। তাঁর বাক্‌ভঙ্গি যতখানি বৈচিত্র্যময়, রঙের জগৎ ততখানি বহুস্তরিক নয়। একইভাবে, একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার এমনকী সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্বিষ্ট আবেগকে প্রকাশ করবার সামর্থ্য প্রধানত রবীন্দ্রনাথের। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুনিপুণ প্রয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা ইন্দ্রিয় বিপর্যাসের সুচারু ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দিয়েছে। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের অধিভাষিক কৌশল প্রায় ক্ষেত্রেই পাঠকৃতিতে চিত্রকল্প সৃজনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলে শেষপর্যন্ত উপমা কিংবা রূপকে পর্যবসিত হয়। এই প্রবণতা তাঁর প্রতীক সৃজনের ক্ষেত্রেও সমভাবে লক্ষণীয়। সার্থক প্রতীকের অন্তর্দেশে যে নিগূঢ় সংজ্ঞাপন-শক্তি প্রোথিত থাকা আবশ্যক তা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্বল্পদৃষ্ট। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপকতা, রক্তপাত, নরনারীর প্রেম ও আত্মবিসর্জনের অনুষঙ্গ বঙ্কিম-উপন্যাসে বহু ব্যবহৃত হলেও কখনোই তা কোনো প্রতীক-চিহ্ন গঠন করে না। অথচ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্যায়ের রচনা *রাজর্ষিতেই* হিংসা রক্তপাত যুদ্ধ এক প্রতীকী তথ্যসংহিতার সূত্রে চিহ্নায়িত। আবার, *কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ* প্রভৃতি উপন্যাসে নবকুমার, নগেন্দ্র কিংবা দেবেন্দ্রের সূত্রে যেমন মাতালের প্রসঙ্গ এসেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসেও উপমানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'মাতাল' শব্দবন্ধ। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসে মাতাল কেবল কোনো চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বিশেষ অনুভবের প্রতীকী দ্যোতক[১]। অনুরূপভাবে, *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে হীরার বাগান তার অচরিতার্থ জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সঞ্চার করেও ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট থেকে দূরবর্তী হওয়ায় তা রসসাফল্য পায় না। অথচ, রবীন্দ্রনাথ *মালঞ্চ* নামকরণের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের পাঠকৃতিতে প্রতীকী আবহ সঞ্চালন করেন। অর্থাৎ, বঙ্কিম-উপন্যাসে উপমার প্রয়োগ সুলভ হলেও শিল্পসার্থক চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার স্বল্প। এভাবে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের সৃজন-সামর্থ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-জগৎ হয়ে উঠেছে পরস্পর থেকে পৃথক, আপন আপন শিল্পস্বাতন্ত্র্যে ঋদ্ধ। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব কবিসত্তা তাঁকে ক্রমশ করে তুলেছে অনন্য, স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের সামান্য প্রবণতাই হল এর কবিত্বময়তা। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। (পরিচ্ছেদ ১০, *শেষের কবিতা*)

এই রোমান্টিক হৃদয়ানুভব কেবল *শেষের কবিতার* ব্যতিক্রমী আকরণেই সুদৃষ্ট নয়, বরং যে কোনো রবীন্দ্র-উপন্যাসেই সহজপ্রাপ্য। আর এখানেই তিনি সকল প্রকার উত্তরাধিকার-উত্তীর্ণ, এক অনন্য শিল্প-পথিকৃৎ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া আলোচনার পাশাপাশি এদের শৈলীগত বিশেষত্ব নিরূপণও একান্ত আবশ্যক। বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহারের বিভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিচে উভয় ঔপন্যাসিকের রচনায় শনাক্তকৃত এ-সকল তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য প্রেক্ষাপটে সূত্রবদ্ধরূপে উপস্থাপন করা হল:

---

[১] রবীন্দ্র রচনায় 'মাতাল' শব্দবন্ধের প্রতীক হয়ে ওঠার ব্যাপ্তিকে অনুধাবনের জন্য রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা ও গানে এই চিহ্নের উপস্থিতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত, তাঁর গানে এর রূপকাভাসিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়—— আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥ (৬৭: ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ)

Dhaka University Institutional Repository

এক. যথার্থ গদ্য সৃজনে দুই কথাশিল্পীই নিজস্ব কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দক্ষ এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রত্যাশী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রবণ গদ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসস্পর্শে অর্জন করেছে ঔপন্যাসিকগুণ। একইসঙ্গে, বিবর্তমান সময়ের ধারাবাহিকতায় তাঁর গদ্যে সমন্বিত হয়েছে স্বকীয় শিল্পস্বভাব। এ কারণেই *দুর্গেশনন্দিনী* আর *সীতারামের* উপমা-চিত্রকল্প এবং প্রতীকের ভাষা অভিন্ন নয়, বরং স্বোপার্জিত বিশ্বাস ও শিল্পবোধের দ্বন্দ্বে ক্রমবিকশিত। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে নির্বাচনকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-উপকরণের ধারাবাহিক মূল্যায়নেই মন্তব্যের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে, বলিষ্ঠ ও শিল্পসমর্থ গদ্যভাষা আয়ত্ত করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। ফলে, সূচনা থেকেই তাঁর গদ্য নান্দনিকতায় উজ্জ্বল, আত্ম-অতিক্রমণের প্রবণতায় প্রাগ্রসর। আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ঔপন্যাসিক গদ্য হয়েছে বিশ্বমানস্পর্শী।

দুই. বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সাধুরীতিকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না; কালসত্যই তার কারণ। ফলে, প্যারীচাঁদ মিত্রের অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও 'আলালী রীতির' একক অথবা ধারাবাহিক ব্যবহার তিনি করেননি। প্রধানত সংস্কৃতানুগ ধ্রুপদী গড়নের গদ্যকে আশ্রয় করেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ নির্মাণ করেছেন। বঙ্কিম-অনুসারী এই প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় সাধুরীতির ওই ভাষাকাঠামোর মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন গতিময় সংজ্ঞাপন-যোগ্যতা। বিশেষত উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজনে তাঁর গদ্যভাষা ধারণ করে আছে সমকালীন মধ্যশ্রেণী বাঙালির সূক্ষ্ম আবেগ ও মনস্তাত্ত্বিক শিল্পস্বর। এ-কারণেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে চলতিরীতির প্রবর্তনা কোনো আকস্মিক নিরীক্ষার ফল নয় বরং ধারাবাহিক উত্তরণ ও অতিক্রমণের নন্দনসূক্ষ্ম স্মারক।

তিন. সমাজসংস্কারকে সচেতনভাবে উপন্যাসে ধারণ করায় সমাজনীতি, ধর্মনীতি কিংবা বিশেষ কোনো আদর্শবাদের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাবন্ধিক-সত্তা ঔপন্যাসিক-সত্তাকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে প্রায়শই। এমনকী উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীককেও প্রভাবিত করেছে প্রাবন্ধিক-বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলক বর্ণনাধর্মিতা। কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসের গদ্য আদ্যন্ত কবির গদ্য। তাই তাঁর উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ বোধে কবিতার মতো নিগূঢ়, আর প্রকাশে উপন্যাসের মতো সমগ্রতাস্পর্শী।

চার. উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল স্বাতন্ত্র্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক। বঙ্কিমচন্দ্র কখনো সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা প্রতীচ্য সাহিত্য থেকে ঋণকৃত অনুষঙ্গকে নিজের অসামান্য সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। কখনো আবার নিখাঁদ নিজস্বতায় সৃজন করেছেন শিল্পঋদ্ধ উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীক। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস রচনার শুরুতে বঙ্কিম-প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েই অতিদ্রুত নিজস্ব উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ গঠনে নিয়োজিত হন এবং কাল পরম্পরায় দ্বন্দ্বময় বৈশ্বিক শিল্পদ্যোতনা আর নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার রসে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেন ঔপন্যাসিক-কবির এক অনন্য শিল্পাদর্শ।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. চারুভাষার চর্চা, মানবচরিত্রজ্ঞান এবং বিশিষ্ট কালচেতনাকে নিজস্ব মাত্রায় ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বকালকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁদের এই কীর্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে সুগভীর ঐতিহ্যবোধ, শিকড়সন্ধানী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং অনন্য সৃজনশক্তি। এ-সকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র কালান্তরেও বহুপঠিত হন, আর রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেন এক চিরকালীন আধুনিকতা।

সুতরাং, বলা যায় যে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের চিহ্নায়নে উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সরে এসে সৃজন করেছেন নিজস্ব শিল্পপন্থা। বাংলা উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পথিকৃৎ-সাফল্যকে সম্মান জানিয়েই রবীন্দ্রনাথ আপন সৃষ্টিশীল জীবনার্থে গড়তে চেয়েছেন এ-সকল শিল্প-উপকরণের নতুনতর প্রাণাবেগী অবয়ব। তাই বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বাংলা উপন্যাস পেয়েছে শৈল্পিক নির্দেশনার প্রথম পাঠ, আর রবীন্দ্রনাথের হাতে সংঘটিত হয়েছে বাংলা উপন্যাসের চিত্রগীতিময় পুনর্জন্ম।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য একান্তভাবেই বঙ্কিমশাসিত। *দুর্গেশনন্দিনী* থেকে *সীতারাম*— এ দীর্ঘ উপন্যাস পরিক্রমায় উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নন্দনতত্ত্বে তাঁর স্বোপার্জিত শিল্পীব্যক্তিত্ব পূর্বাপর সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্চার করেছেন নতুনত্বের স্বাদ; তাঁর উপন্যাসে সুগভীর অভিব্যক্তি আর ভাষার চারুত্বে সম্প্রসারিত হয়েছে শিল্পভাষার ভিন্নতর বিন্যাস। এই স্বাতন্ত্র্যকামী প্রচেষ্টা তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন সফলতা প্রদান না করলেও আমৃত্যু নান্দনিকতায় উদ্দীপিত করেছে। ইতিহাস আর রোমান্সের সীমার মধ্যে থেকেই তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল সামাজিক ও অন্যান্য উপন্যাস নিজস্ব চিহ্নায়ন ও শৈলীগত বিশেষত্বকে রেখেছে অক্ষুণ্ন । এ-সকল রচনার সংরূপকে আত্মস্থ করে এক সামগ্রিক নন্দনচেতনার রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন। বিশেষত, *আনন্দমঠ*, *দেবীচৌধুরাণী* কিংবা *সীতারামের* মতো উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য সত্য। বস্তুত, শিল্পীস্বভাবে সচেতনভাবে যে উপযোগিতাবাদী মনোভঙ্গিকে বঙ্কিমচন্দ্র লালন করেছেন, বিভিন্ন উপন্যাসের সামগ্রিক রসপরিণতিকে বাধাগ্রস্ত করলেও তা সংশ্লিষ্ট পাঠকৃতির উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহারকে আহত করেনি। ভিন্ন কথায় বলা যায় যে, উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক সৃজনের সুযোগ ও যোগ্যতা, সকলপ্রকার সাহিত্যনীতির অচলায়তন ভেদ করে তাঁকে দিয়েছে শিল্পমুক্তির শক্তি। একদিকে সচেতন নীতিবোধ অপরদিকে অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি-প্রেরণা জৈবসমসত্ত্বে জারিত হয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের নান্দনিকতাকে সংজ্ঞাপিত করেছে। তাই বঙ্কিম-উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ হয়ে উঠেছে নীতিপ্রচ্ছাদিত জীবন ও সমাজবোধ অতিক্রমী ঔপন্যাসিকের শিল্প-অভীপ্সার স্মারক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ এবং তাঁর উপন্যাসে বিধৃত মানবজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপন্থাকে আশ্রয় করে নয় বরং ভিন্নতর প্রতীতি এবং পর্যবেক্ষণে বিশ্বমানস্পর্শী দার্শনিকতায় সুচিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু প্রধানত রোমান্টিক কবি, সেহেতু তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাববিশ্ব কখনোই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যমূলকতায় আচ্ছন্ন হয় না, কিংবা তাঁর নান্দনিক শিল্পপ্রাণতা ক্ষণিক ভাবাদর্শ বিস্তার করেই ফুরিয়ে যায় না। বরং কোনো বিশেষ তত্ত্ব কিংবা মতবাদ প্রতিষ্ঠার সচেতন তাগিদ সত্ত্বেও রবীন্দ্র উপন্যাসে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এক গভীর শিল্পোজ্জ্বল দার্শনিকতা যা চিরায়ত হয়েও বিশেষ দেশকালসমাজের প্রবণতাকে ধারণ করে; আধুনিক মানব-মনস্তত্ত্বকে অনন্য জীবনবোধ এবং

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পজিজ্ঞাসায় প্রাণিত করে তোলে। বলা চলে, উপন্যাসের পাঠকৃতি নিয়ত নিরীক্ষাপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত শিল্পান্বেষণক্ষেত্র। তিনি কখনোই তাঁর কবিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপন্যাস রচনায় সচেষ্ট হননি, হওয়া সম্ভবও নয়। বস্তুত, রোমান্টিক কবিতায় অনির্দেশ্য ভুবনের প্রতি একান্ত আকাঙ্ক্ষা কবির বাস্তব জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করতে তৎপর থাকে; যা থেকে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথর উপন্যাস-আশ্রয়ী বাস্তবকে প্রায়শ কবির উপলব্ধিতে ধারণ করতে চেয়েছেন। অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বে তিনি তাই উপন্যাসের কাঠামোতেই সঞ্চার করেন কাব্যময় জীবনস্বরূপ। ফলে, তাঁর উপন্যাস ও কবিতা প্রায়শই বোধে সমধর্মী, প্রকাশে পৃথক।

কবিপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র এবং অবিসংবাদিত কবি রবীন্দ্রনাথের মানস গঠনে যে মৌলিক ব্যবধান শনাক্তকৃত, তা তাঁদের উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের সংগঠনেও সমভাবে লক্ষণীয়। তাঁদের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ মূলত ব্যঞ্জনা সঞ্চারে স্বতন্ত্র, চিহ্নায়নে ব্যতিক্রমচিহ্নিত, শৈলীগত মানদণ্ডে ভিন্ন। বলা যায় যে, উভয় শিল্পীর উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের জগৎ তাঁদের স্বোপার্জিত নান্দনিকবোধ ও সার্বভৌম চিহ্নায়ন কুশলতাকেই নির্দেশ করে। তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসের বিচিত্র শিল্প-উপকরণে চিরায়ত মানবের বহুলাঙ্গ মনোসম্পর্ক সুবিন্যস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যতখানি সত্তাভিমুখী ছিল ততখানি পঙ্কিলতায় আবর্তিত মানুষের সংকটাভিমুখী ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপমা, চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকের জগৎ ইতিহাস সমাজ আর আরোপিত বিশ্বাস লালিত মানবহৃদয়কে স্পর্শ করেই পূর্ণতা পায়। অপরদিকে, রবীন্দ্রনাথ, মানবের অতলান্ত হৃদয়ানুভূতিকে সকল নান্দনিক উপকরণের আশ্রয়ে গ্রথিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবুও তাঁদের সৃষ্টি ত্রিশের ঔপন্যাসিকদের লেখনীকে আধুনিক মানুষের যাপিত জীবনের আলো-অন্ধকারের রূপায়ণে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক তাই কালিক-শক্তিতেই ঋদ্ধ নয়, কালাতিক্রমণের সামর্থ্যেও চির-উজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

উপমার সম্পূরক তালিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা যৌবনে পরমা সুন্দরী ছিলেন। প্রভাতের চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

২. কি চক্ষু! সুদীর্ঘ; চঞ্চল; আবেশময়! কোন কোন প্রগল্‌ভ-যৌবনা কামিনীর চক্ষু দেখিবামাত্র মনোমধ্যে বোধ হয় যে, এই রমণী দর্পিতা; এ রমণী সুখলালসাপরিপূর্ণা। বিমলার চক্ষু সেইরূপ। (প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৩. কুসুমের মালার তুল্য মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণীরাজি গ্রথিত থাকিত; তুমি কি তোমার বিমাতা সকলকেই চিনিতে? (দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৪. বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত তাহার দংশন অসহ্য; এক দিনে কত মুহূর্ত্ত! তথাপি দিন কি গেল না। (দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, *দুর্গেশনন্দিনী*)

৫. শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বত-শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল। (প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৬. বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৭. যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা ঊষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত, সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। ... তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৮. নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়— মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যপ্রভা বর্দ্ধিত হইল। (দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

৯. মহম্মদীয় সম্রাট কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য অস্তগামী হইল। (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

১০. লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল। (তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

১১. নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *কপালকুণ্ডলা*)

১২. কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত ও স্নাত করাইলে— কুন্দ শিশরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১৩. সূর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। (সপ্তম পরিচ্ছেদ, *বিষবৃক্ষ*)

১৪. কামিনী বলিল, "দিদি শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস না?
আমি বলিলাম, "জানি। সে নন্দন-বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। (প্রথম পরিচ্ছেদ, *ইন্দিরা*)

১৫. আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। (একাদশ পরিচ্ছেদ, *ইন্দিরা*)

১৬. তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম। কিন্তু আমি যাই হই, হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম। (ষোড়শ পরিচ্ছেদ, *ইন্দিরা*)

১৭. হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিল। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *যুগলাঙ্গরীয়*)

Dhaka University Institutional Repository

১৮. যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। ... যুবতীর হস্তসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি? (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল— কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগল— কত কাঁদিল— তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

১৯. দুই জনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদ চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল। (পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, চন্দ্রশেখর)

২০. ... অশ্বের আঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা— সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল— ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে— দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল। (ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, *চন্দ্রশেখর*)

২১. তার পর রাধারাণী বিষণ্ন মনে ভাবিল, তা যেন হলো; তাতেও বড় গোল! মমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে— তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ— যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ! এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, *রাধারাণী*)

২২. কি বলিয়া বলিব— উপযুক্ত কথা পাই না— ছোট বাবু হাত ধরিলেন।
যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল— যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

২৩. রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম— ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব— আমি তাহা চাহিতাম না— আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই— আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র— শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। (চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *রজনী*)

২৪. ... রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ— রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল— শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

Dhaka University Institutional Repository

২৫. কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ— বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল, — কোথাও কিছু নাই— অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলে— ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। (প্রথম খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, *কৃষ্ণকান্তের উইল*)

২৬. রাজসিংহ নয়ননামা গিরিসঙ্কটে পার্ব্বত্য পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতগামী দূতমুখে আকব্বরের সংবাদ শুনিয়া, রণপাণ্ডিত্যের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করিয়া আমিষলোলুপ শ্যেণপক্ষীর মত দ্রুতবেগে সেনা সহিত পূর্ব্বপরিচিত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই গিরিসানুদেশে সসৈন্যে উপবিষ্ট হইযাছিলেন। (সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

২৭. মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরঙ্গনাগণ, ঠিক সেইখানে, পৌরঙ্গনাদিগের সম্মুখে, রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন।... যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল-কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কালভূজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। (সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *রাজসিংহ*)

২৮. গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না— থাক্‌তে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত— তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *দেবী চৌধুরাণী*)

২৯. কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল— আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন? (দ্বিতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, *দেবী চৌধুরাণী*)

৩০. সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশি মধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারি দিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূলবাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, সীতারাম)

৩১. রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। (প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

৩২. রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, *সীতারাম*)

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মত অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণকিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল। (পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

২. বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিয়াছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে— বিভা ছোটো পাখিটির মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৩. উদয়াদিত্য মনে করিলেন, 'এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না'। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৪. বিভাই তাহার [উদয়াদিত্য] একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণপণে উপভোগ করেন। (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *বউঠাকুরানীর হাট*)

৫. বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন তখন সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছে, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সুবর্ণরেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায় রঞ্জিত ঘন ঘন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মতো দেখাইতেছে। (পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৬. কুটিরের দিকে চাহিয়া রাজার গত বৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ ঘনবর্ষ। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। (সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ, *রাজর্ষি*)

৭. কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিযা দেয়, দুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে— আশার সেইরূপ হইল। (পরিচ্ছেদ ৫, *চোখের বালি*)

৮. তাহার [বিনোদিনীর স্বামী] মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মূহ্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। (পরিচ্ছেদ ৭, *চোখের বালি*)

৯. বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরে নিখাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল— সুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্যাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। (পরিচ্ছেদ ১৫, *চোখের বালি*)

Dhaka University Institutional Repository

১০. অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাসে চেনা হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। কলেজের লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ এক একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীড়ে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। (পরিচ্ছেদ ২০, *চোখের বালি*)

১১. কিন্তু এ ভাষায় কোনোমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। দু-চার লাইন পড়িবা মাত্র একটা সুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মতো মনকে চারি দিকে ছাপাইয়া ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। (পরিচ্ছেদ ২০, *চোখের বালি*)

১২. এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়, আর-একদিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। (পরিচ্ছেদ ২৬, *চোখের বালি*)

১৩. নতুন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেপথ্যদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ৪২, *চোখের বালি*)

১৪. কোথাও তাহার সুখ নাই— সমস্ত পৃথিবী সর্বত্রই যেন মধ্যাহ্নের মরু ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৪৩, *চোখের বালি*)

১৫. ... বিনোদিনী যে সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না।... তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্ব সংগীতের মাঝখানে তাহারর মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতেছে। (পরিচ্ছেদ ৪৮, *চোখের বালি*)

১৬. চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে— কল্যাণীকে পূর্ণ মহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। (পরিচ্ছেদ ৪, *নৌকাডুবি*)

১৭. হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল, "বাবা আমি ইহার কিছুই জানিনা।" এই বলিয়া, ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্যাস্তের ম্লান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সে চলিয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ১৪, *নৌকাডুবি*)

১৮. সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্য হইতে বিকারের পাংশুবর্ণ হাসির মতো একবার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২৯, *নৌকাডুবি*)

১৯. কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে-একটা ছবি উঠিয়াছে তাহা একটি পেনসিলের ক্ষীণ রেখা মাত্র; তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও রঙ ফলানো হয় নাই। (পরিচ্ছেদ ৩১, *নৌকাডুবি*)

Dhaka University Institutional Repository

২০. উষার আলো যেমন দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্র ফুটিয়া পড়ে, কমলার নারী প্রকৃতি তেমনি অতি অল্পকালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ৩৪, *নৌকাডুবি*)

২১. গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্যসম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মতো বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। (পরিচ্ছেদ ৩২, *গোরা*)

২২. হারানবাবু কোনো কথা না বলিয়া আসন্ন ঝড়ের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। (পরিচ্ছেদ ৩৯, *গোরা*)

২৩. এই বলিয়া গোরা চলিয়া গেল। ঘরের ভিতরকার বাতাস যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুচরিতা মূর্তির মতো নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। (পরিচ্ছেদ ৫৭, *গোরা*)

২৪. অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরতে জানত না— হিন্দু ঠিক তার উলটো। (পরিচ্ছেদ ৬৫, *গোরা*)

২৫. শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক— তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। (জ্যাঠামশাই ১, *চতুরঙ্গ*)

২৬. জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে। (জ্যাঠামশাই ৫, *চতুরঙ্গ*)

২৭. ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। (জ্যাঠামশাই ৫, *চতুরঙ্গ*)

২৮. শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। (শ্রীবিলাস ২, *চতুরঙ্গ*)

২৯. ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপর লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। (শ্রীবিলাস ৫, *চতুরঙ্গ*)

৩০. হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্তোমুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩১. এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটা ছোটো নদী; তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা। কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বাণ ডেকে এল; আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

৩২. আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না; প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে! এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো। (বিমলার আত্মকথা, *ঘরে-বাইরে*)

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক। (পরিচ্ছেদ ২, *যোগাযোগ*)

৩৪. সেদিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল। বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা ঝাঁকানি ক্রুদ্ধ অধৈর্যের মতো। ... বাতাস ব্যাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ করে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে লেজ ঝাপটা দিয়ে পাক খেয়ে বেড়ায়। (পরিচ্ছেদ ৭, *যোগাযোগ*)

৩৫. বৈশাখ-জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামলে মাটি যেমন দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল। (পরিচ্ছেদ ১২, *যোগাযোগ*)

৩৬. কুমু কাল সন্ধের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ সে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগল। (পরিচ্ছেদ ১৭, *যোগাযোগ*)

৩৭. [শ্যামাসুন্দরীর] বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। (পরিচ্ছেদ ২৯, *যোগাযোগ*)

৩৮. তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্তে মধুসূদনের মাথায় চড়ে উঠল। (পরিচ্ছেদ ৩৯, *যোগাযোগ*)

৩৯. শ্যামার সম্বন্ধে ওর [মধুসূদন] কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না কিন্তু ওতে আরাম আছে। (পরিচ্ছেদ ৫০, *যোগাযোগ*)

৪০. অমিত বলে, 'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি। (পরিচ্ছেদ ১, *শেষের কবিতা*)

৪১. এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো— ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। (পরিচ্ছেদ ২, *শেষের কবিতা*)

৪২. উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে মেয়েটির [লাবণ্য] কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের মতো মসৃন এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট্‌বইখানা খুলে লিখলে, 'এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে— নিকোটিনের ঝাঁঝ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ। (পরিচ্ছেদ ২, *শেষের কবিতা*)

৪৩. লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যে পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। (পরিচ্ছেদ ৫, *শেষের কবিতা*)

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. আমার [অমিত] মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদি কালের পুরোনো-ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিষ্কার। (পরিচ্ছেদ ৬, *শেষের কবিতা*)

৪৫. স্ত্রী [শর্মিলা] সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আর তো পারি নে। তোমার [শশাঙ্ক] কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!" যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলি হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো। (শর্মিলা, *দুইবোন*)

৪৬. বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। (নীরদ, *দুইবোন*)

৪৭. ঊর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে? (নীরদ, *দুইবোন*)

৪৮. শশাঙ্কর মনটা এখন জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থমথমে হয়ে এসেছে। (ঊর্মিমালা, *দুইবোন*)

৪৯. ঊর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিতে আঁকড়ে আছে কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডবর্ণ হয়ে আসে। (ঊর্মিমালা, *দুইবোন*)

৫০. সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটা অর্‌কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। (পরিচ্ছেদ ২, *মালঞ্চ*)

৫১. ইন্দ্রনাথকে ভাল দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘসা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। (প্রথম অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

৫২. সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিল বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। (তৃতীয় অধ্যায়, *চার অধ্যায়*)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
মৃণালিনী (১৮৬৯)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
ইন্দিরা (সংশোধিত সং ১৮৯৩)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
রজনী (১৮৭৭)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
রাধারাণী (১৮৭৭)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
রাজসিংহ (সংশোধিত সং১৮৯৩)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
আনন্দমঠ (১৮৮২)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)
সীতারাম (১৮৮৭)	বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ (একাদশ প্রকাশ, ১৩৯১)

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

বউ ঠাকুরাণীর হাট (১২৮৯)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
রাজর্ষি (১২৯৩)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
চোখের বালি (১৩০৯)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
নৌকাডুবি (১৩১৩)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
গোরা (১৩১৬)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২

Dhaka University Institutional Repository

চতুরঙ্গ (১৩২৩)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
ঘরে-বাইরে (১৩২৩)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
যোগাযোগ (১৩৩৬)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
শেষের কবিতা (১৩৩৬)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
দুই বোন (১৩৩৯)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
মালঞ্চ (১৩৪০)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২
চার অধ্যায় (১৩৪১)	রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অচ্যুত গোস্বামী ; *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬৮

অজয়কুমার ঘোষ ; 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: উপমা', *বঙ্কিমচন্দ্র: আধুনিক মন*, সম্পা. ক্ষেত্রগুপ্ত, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯

অমলেন্দু বসু ; *সাহিত্যলোক*, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৭১

সাহিত্যচিন্তা, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭২

অরবিন্দ পোদ্দার ; *বঙ্কিম মানস*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৫১

রবীন্দ্র মানস, কলকাতা: ইন্ডিয়ানা, ১৯৫৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; *কালের প্রতিমা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ; *শিল্পিত স্বভাব*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৯

অশ্রুকুমার সিকদার; *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮

চোখের দুটি তারা : দুই বাংলার কবিতা, কলকাতা: প্যাপিরাস,২০০০

আশুতোষ ভট্টাচার্য ; *বঙ্কিম উপন্যাসের শেষপর্ব*, কলকাতা: এ. মুখার্জি, ১৯৮১

আহমদ কবির ; *রবীন্দ্র কাব্য : উপমা ও প্রতীক*, ঢাকা: বর্ণমিছিল, ১৯৭৪

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় ; *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার*, কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৮০

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ; *কবিতা ও আধুনিকতা*, কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৩

ক্ষেত্রগুপ্ত ; *বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি*, কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৯৮৭

বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯

ক্ষুদিরাম দাস ; *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়*, কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৬১

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়; ১৯৬৬

বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪

গুণময় মান্না ; *রবীন্দ্র কাব্য-রূপের বিবর্তন রেখা*, কলকাতা, ১৯৬৫

গুরুদাস ভট্টাচার্য ; *বাক্‌প্রতিমা : বাংলা ভাষাতত্ত্ব*, কলকাতা, ১৯৭৬

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী ; *বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকরণ ও প্রবণতা*, কলকাতা, ১৯৯১

রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প, কলকাতা, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

গোপালচন্দ্র রায় ; *বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬৩

চৈতালী সাহা : *রবীন্দ্রনাট্যে প্রতিমা*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ, ১৯৯০

জগন্নাথ চক্রবর্তী ; *মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প*, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৭৮

জাহাঙ্গীর তারেক; *প্রতীকবাদী সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

তপোধীর ভট্টাচার্য ; *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, কলকাতা: অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭

রোলাঁ বার্ত, পাঠকৃতি ও পাঠক, কলকাতা: অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৮

উপন্যাসের প্রতিবেদন, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯

দেবেশ রায় ; *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য*, কলকাতা, ১৯৭৮

দেবীপদ ভট্টাচার্য ; *উপন্যাসের কথা*, কলকাতা, ১৯৬২

রবীন্দ্র-চর্যা, কলকাতা, ১৯৭৩

রূপ, রস ও সুন্দর : নন্দনতত্ত্বের জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮১

নরেন বিশ্বাস ; *অলঙ্কার অন্বেষা*, কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৬

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ; *কথকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ১৯৭৫

নীহাররঞ্জন রায় ; *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৭৫

পবিত্র সরকার ; 'বাংলা গদ্য: রীতিগত অনুধাবন', *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*, সম্পা.ড. অরুণকুমার বসু, কলকাতা: সমতট প্রকাশন, ১৯৯২

প্রণয়কুমার কুণ্ড ; 'রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান', *বাংলা গদ্যজিজ্ঞাসা*, সম্পা.ড. অরুণকুমার বসু, কলকাতা: সমতট প্রকাশন, ১৯৯২

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ; *রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৭৩

বার্ণিক রায় ; *প্রতীক অরণ্য, প্রাচী প্রতীচী*, কলকাতা, ১৯৭৩

কবিতা : চিত্রিত ছায়া, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮১

বুদ্ধদেব বসু ; *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৭৩

সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৯১

বেগম আকতার কামাল; *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ; *বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা, ১৯৬৯

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় ; *বঙ্কিমচন্দ্র : সৃজন ও বীক্ষণ*, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১

ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, ঢাকা নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৪

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ; *রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

মুনীর চৌধুরী; *বাংলা গদ্যরীতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

মোহিতলাল মজুমদার ; *বঙ্কিম বরণ*, কলকাতা, ১৯৫০

'বঙ্কিমচন্দ্র', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৪

'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ট্রাজেডি তত্ত্ব', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা:মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৪

শঙ্খ ঘোষ ; *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, কলকাতা, ১৯৪৯

শব্দ আর সত্য, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ; *শিল্পলিপি*, কলকাতা: এ. মুখার্জি,১৯৮১

শিশির চট্টোপাধ্যায় ; *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা*, কলকাতা: রীডার্স কর্ণার, ১৯৬১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৭৩

শ্যামলী চক্রবর্তী ; *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ*, কলকাতা: অরূপা প্রকাশনী, ১৯৯০

সত্যেন্দ্রনাথ রায় ; *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭২

সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, ১৯৭৪

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র চিত্রকল্প*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪

উত্তর প্রসঙ্গ, কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১

সিদ্দিকা মাহমুদা ; *রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১

সুকুমার সেন ; *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬৬

সুধীরকুমার নন্দী ; *নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা, ১৯৭৯

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; *বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা, ১৯৬১

সুরভি বন্দোপাধ্যায় ; *সাহিত্যের শব্দার্থকোশ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৯৯

সৈয়দ আকরম হোসেন; *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮

প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স,১৯৯৭

সৈয়দ আলী আহসান ; *কবিতার রূপকল্প*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; *রবীন্দ্র চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৮২

হরপ্রসাদ মিত্র ; *বঙ্কিম সাহিত্য-পাঠ*, কলকাতা, ১৯৬৩

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abrams, M.H. 1993. *A Glossary of Literary Terms*, Bangalore: Prism Books Pvt. Ltd

Barthes, Roland ([1964] 1977). *Elements of Semiology*. (Translated by Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan Cape.

Bodkin, Maud.1962. *Archetypal Patterns in Poetry*, Oxford Paper Back publications

Bowra, C. M. 1954.*The Heritage of Symbolism*, London

Brown, Stephen J. 1927. *The World of Imagery*, London: Kegan Paul, trubner and Co. Ltd.

Caudwell, Christopher. 1937(reprinted 1966). *Illusion and Reality*, Lawrence & Wisha

Chandler, Daniel. 2002. *Semiotics The Basics*, Routledge

Culler, Jonathan.2002. *Structuralist Poetics*, Routledge

Dhaka University Institutional Repository

Culler, Jonathon.2001. *The pursuit of Sign*, Routledge

Danesi, Marcel & Perron, Paul. (1999). *Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook*. Bloomington: Indiana UP.

Danesi, Marcel. (1994). *Messages and Meanings: An Introduction to Semiotics*. Toronto: Canadian Scholars' Press.

Danesi, Marcel. (2002). *Understanding Media Semiotics*. London: Arnold; New York: Oxford UP.

Derrida, Jacques (1981). *Positions*. (Translated by Alan Bass). London: Athlone Press.

Eagleton, Terry. (1983). *Literary Theory: An Introduction*. Oxford: Basil Blackwell.

Eco, Umberto .1976. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

Eco Umberto .1979. *The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts*, Bloomington, Indiana University Press.

Eliot.,T. S. 1975 (Reprnd) *The Use of Poetry and the Use of Criticism* (London, Faber and Faber Limited,

Fischer, Ernest. 1963. *The Necessity of Art*, London

Fiske, John. 1997. *Introduction to Communication Studies*, Routledge

Forster, E. M. 1970. *Aspects of the Novel*, London

Gordon, Terrence.2002. *Saussure for Beginners*, Chennai, Orient Longman

Hawkes, Terence .1977. *Structuralism and Semiotics*, London: Routledge

Hawthorn, Jeremy. 2000. *A Glossary of Contemporary Literary Theory*, London: Arnold

Hjelmslev, Louis (1961). *Prolegomena to a Theory of Language*. (Translated by Francis J. Whitfield). Madison: University of Wisconsin Press.

Hough, Graham.1969. *Style and Stylistics*, London: Routledge &Kegan Paul

Jespersen, Otto. 1968. *The Philosophy of Grammar*, London: George Allen and Unwin Ltd.

Kermode, Frank. 1972. *Romantic Image*. London: Routledge and Kegan Paul

Lewis, C Day. 1968. *The Poetic Image*, London: Jonathan Cape

Lidov, David (1999) *Elements of Semiotics*. New York: St. Martin's Press.

Lodge, David. 1984. *Language of Fiction*, Routledge

Lotman, J.M.1966. *Problems in the typology of Text in Sovit Semiotics: An Anthology.*

Lotman, Yuri L. (1990). *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. (Translated by Ann Shukman). London: Tauris.

Dhaka University Institutional Repository

Lucid, Daniel P. (ed.) Baltimore & London: John Hopkins University Press

Mukarovsky, Jan. 1964. 'Standard Language and Poetic Language', A Prague School Reader on Esthetics, *Literary Structure and Style*, Washington. D. C: Georgetown University Press

Mukherjy, Ramranjan. 1991. *Comperative Aesthetics*, Kolkata

Pearsall,Judy and Trumble, Bill (ed.). 1996. *The Oxford English Reference Dictionary*, New york, Oxford University press

Pound, Ezra. 1913. 'A few point', *Poets on Poetry*, ed. by Charles Norman, Free press paperback edition 1965

Read, Herbert. 1951. *The Meaning of Art*, London

Samuel Taylor Coleridge.1969 (Reprntd). *Biographia Literaria*, London: Oxford University Press

Saussure, Ferdinand de .1916. *Course in General Linguistics*, ed. Charles Bally and Albert Sechehaye, trans. Wade Baskin, New York: Philosophical Library, 1959.

Sebeok, Thomas A. (Editor) (1977). *A Perfusion of Signs*. Bloomington, IN: Indiana University Press

Silverman, Kaja.1983. *The Subject of Semiotics*, New York: Oxford University Press

Turner, G. W. 1973. *Stylistics*, London: Penguin

Veivo, Harri. 2001. *The Written Space*, Imatra, Acta Semiotica Fennica x & International Semiotic Institute

Wells, Rulon. 1960. 'Nominal and Verbal style', *Style in Language*, ed. by Sebeok Thomas, Cambrige: The MIT press